শ্রীচৈতন্য ঃ একালের দৃষ্টিকোণ

সম্পাদক

ক্ষেত্র গুপ্ত

যুগ প্রকাশনী

প্রযত্নে অনুবাদ পত্রিকা □ ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলিকাতা-৯

□ প্রকাশক :
যুগ প্রকাশনীর পক্ষে,
অরূপ কুমার রায়

□ প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা,
২৪শে আষাঢ়, ১৩৬৩
৯ই জুলাই, ১৯৫৬

□ প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

□ মুদ্রক :
গৌর মান্না
করুণাময়ী প্রেস
৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

১

ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে চৈতন্যের স্মরণ ও বন্দন এক অবশ্যকৃত্য। পাঁচশ বছরের জয়ন্তী উৎসবে সেই ধর্মীয় আবেগ আরও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতেই পারে। এখনও এমন লোক আছেন, খুব বেশি সংখ্যায়ই আছেন, যাঁরা কেউ বৈষ্ণব, কেউ নন—তবে ধর্মপ্রাণ বটেই, যাঁরা বিশ্বাস করেন চৈতন্য স্মরণে পাপতাপ-ক্লিষ্ট সংসারী জীবের মুক্তি হবে। সেদিক থেকে পাঁচ শত তম বছরটিকে বিশেষভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। অবশ্যই সে-রকম কোন বিশ্বাস বা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ বই সম্পাদনা করতে বসি নি।

আবার এমন আশাও করি নি যে প্রকাশকের সঙ্গে মিলে এই মরশুমে ভালো কিছু বিক্রি-বাটা করে নেব—কারণ শুকনো তাত্ত্বিক প্রবন্ধের ছোট বাজার চৈতন্যের পাঁচশ বছরের মাহাত্ম্যে ফুলে ফেঁপে তেজি হয়ে উঠবার কিছুমত্রে সম্ভাবনা নেই।

চৈতন্যপন্থা একালের মানুষকে আলো দেখাবে—এমন অনৈতিহাসিক ভরসা আমার নেই। আবার কতিপয় বুদ্ধিজীবীর মননবিলাস নয় আমাদের এ-কাজটি। আমি নিজে সব ভক্তিহীনতা এবং অবিশ্বাস নিয়েও মধ্যযুগের সব চেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব বলে চৈতন্যকে মনে করি, চৈতন্য-আন্দোলনকে সেকালীন বাংলার সবচেয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ ব্যাপার বলে বুঝি। নাই বা আদৌ সম্ভব হল এ কালে কাজে লাগানো, কোন পুরনো রাস্তা ধরে নতুন জীবন চলে না—তবুও নিজের জাতির ঐতিহ্যকে জেনে নেওয়া চাই, 'আইডল অফ দি মার্কেট প্লেস' বেকন-কথিত সেই বহুপ্রচলিত গণ-বিশ্বাসের আবর্তে যেন আটকে না থাকি। পাঁচশ বছর একটা বড় কাল-ব্যবধান। এতটা দূর থেকে প্রাচীন মহিমাকে কেমন দেখায় সেটা বুঝবার একটা সুযোগ মিলল। আর সময়-মাহাত্ম্যে প্রকাশকের মুদ্রণ ব্যয় যদি উঠে যায়, এমন ক্ষীণ আশাও নেই বলব না।

২

ভক্ত বিশ্বাসীরাও চৈতন্যের মানবিক উদারতা, নিম্নকোটির প্রতি দয়া, তাদের মহিমা দান—প্রভৃতি গুণাবলীর কথা বলতে পারেন। ভক্তিবাদীদের মানবমুখিতার সেই

সীমা। এর পরে স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা আর এগুবেন না। আমাদের আরম্ভ সেখান থেকে। সেটা প্রথম ধাপ। আমরা সব দেবত্ব এবং অলৌকিকতার রঙ ঝরিয়ে এই বিশাল মানুষের মানবিক কীর্তির কথা ভাবতে চেয়েছি। সামাজিক পটভূমির এবং চৈতন্যপন্থার সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি। অর্থনৈতিক ভিত্তি, শ্রেণীগত বিন্যাসের কথা ভেবেছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা, তার ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রতিক্রিয়া পর্যালোচন করেছি। ধর্মের যে একটা সমাজতত্ত্ব আছে, দর্শনের গোড়ায় আছে শ্রেণী চেতনা এ কথা মনে রেখে আমাদের ব্যাখ্যান।

চৈতন্য যদি মাত্র ধর্মগুরু হতেন, তাহলেও এরূপ পর্যবেক্ষণ করা চলত—যদিও তা হত অনেক সরল ধরনের। এবং আমরা সে-কাজে উৎসাহী হতাম না। এই ধর্মগুরু গোটা সমাজকে নাড়িয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন বলেই আমরা আগ্রহী।

যে লেখকগোষ্ঠীকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাঁরা অনেকেই চৈতন্য ধর্ম দর্শন সাহিত্য নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের চর্চা আছে। লেখকদের কেউ কেউ বৈষ্ণব ধর্মে নিষ্ঠাবান, কেউ সাধারণভাবে ভক্তিধর্মের প্রতি বিমুখ নন। অবশ্য কয়েকজন মার্কসবাদী। তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে স্বাভাবিক ভাবেই পার্থক্য আছে। কিন্তু সকলেই তাঁদের প্রবন্ধে সমাজমনস্কতা দেখিয়েছেন ; ভাবব্যাকুলতায় নয়, বস্তুনিষ্ঠায় ও যুক্তিপ্রাণতায় চৈতন্য ও চৈতন্য-আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজেছেন। এখানেই এই প্রবন্ধ সংকলনের মূল সূত্র।

সম্পাদক হিসেবে আমি সব প্রবন্ধের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। হবার প্রয়োজনও দেখি না। একালের মননশীলতা বিচিত্র ভাবে রচনাগুলির মধ্যে সক্রিয় আছে। নানা রঙের ও জাতের ফুল ফুটুক, গাছের গোড়ায় থাক একালের বোধ ও বুদ্ধি।

গ্রন্থটি প্রকাশে প্রকাশক যে যত্ন নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

ক্ষেত্র গুপ্ত
সম্পাদক

সম্পাদক

ক্ষেত্র গুপ্ত পি. এইচ. ডি, ডি. লিট। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। আধুনিক সাহিত্য বিশেষ করে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গবেষণা। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা চল্লিশের বেশি। তার মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে চারটি বই আছে। সাম্প্রতিক গ্রন্থ-'রবীন্দ্র গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব'।

লেখক পরিচয়

কুমারেশ ঘোষ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কৌতুক রসাত্মক রচনার জন্য বিখ্যাত। 'ষষ্টিমধু' নামক ব্যঙ্গ-কৌতুকের পত্রিকার সম্পাদক। উপন্যাস ছোট গল্প নাটক ভ্রমণ কাহিনীর লেখকরূপে সর্বজন পরিচিত। সম্প্রতি 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটিকে একালের বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন এবং 'রঙ্গপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে একটি পুস্তক লিখেছেন।

রবীন্দ্র গুপ্ত

পি. এইচ. ডি। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মার্ক্সীয় তত্ত্বে সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য সংস্কৃতির মার্ক্সবাদী ভাষ্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদর্শন এবং আধুনিক উপন্যাস বিষয়ে গবেষণা গ্রন্থ আছে। সাম্প্রতিক রচনা 'সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি।'

সনৎকুমার মিত্র

পি. এইচ. ডি। নিউ ব্যারাকপুর কলেজ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লোকসংস্কৃতিবিদ্ রূপে প্রতিষ্ঠিত। লোকসংস্কৃতি ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উপরে গবেষণা। সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বাংলার লোকবাদ্য'।

প্রদীপ কুমার ঘোষ

পি. এইচ. ডি। পেশা শিক্ষকতা এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা। প্রধান গ্রন্থ 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিচয় (১ম ভাগ), 'কর্ণাটকী সঙ্গীত সমীক্ষা', 'বৃহদ্দেশী', 'দত্তিলম্'।

বিজিত কুমার দত্ত

পি. এইচ. ডি, ডি. লিট। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাক্তন বিভাগীয় এবং কলা বিভাগের ডিন। উপন্যাস এবং প্রাচীন নাটক বিষয়ে গবেষণা। আধুনিক এবং পুরাতন সাহিত্যে সমান অধিকারী। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রয়াসী। সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য চরিত।'

পল্লব সেনগুপ্ত

পি. এইচ. ডি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্মালয়ের অধ্যাপক। লোকসংস্কৃতির গবেষক, আধুনিক সাহিত্যেরও বিশিষ্ট বিচারক। ডিরোজিও, বাঙালীর ইংরেজী কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা। অনেকগুলি প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে সাম্প্রতিক রচনা 'পূজাপার্বনের উৎস কথা' মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে লোক-ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পি. এইচ. ডি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্মালয়ের অধ্যাপক। মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে বহু গবেষণা। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেকালের সাহিত্য পটভূমির ব্যাখ্যানপ্রয়াসী। সাম্প্রতিক গ্রন্থ-'রাজসভার কবি ও কাব্য' এবং আলাওলের পদ্মাবতীর সটীক সম্পাদনা (জায়সীর সঙ্গে বিস্তৃত তুলনাসহ)।

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পি. এইচ. ডি। বর্ধমান বিশ্ববিত্মালয়ের অধ্যাপক। মধযুগের সাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বৈষ্ণব আখ্যান কাব্য নিয়ে গবেষণা। সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'কৃষ্ণকথায় মালাধর'।

কানন বিহারী গোস্বামী

পি. এইচ. ডি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্মালয়ের অধ্যাপক। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে গবেষণা। তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুদিকেই সমান আগ্রহী। প্রকাশিতব্য-গ্রন্থ 'বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়'।

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পি. এইচ. ডি। কল্যাণী বিশ্ববিত্মালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। নাট্য বিষয়ে গবেষণা। নাটক ও নাট্যান্দোলন সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বাংলা পৌরাণিক নাটক'।

মহাপুরুষ মহাপ্রভু

কুমারেশ ঘোষ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুধু ধর্মগুরুই ছিলেন না, ছিলেন কর্মগুরু, মর্মগুরু, সমাজগুরু, হিন্দুধর্ম সংস্কারক। মহাপ্রভু ছিলেন মহা-পুরুষ। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ-সিংহ।

সারা নদীয়া তথা সমগ্র গৌড় তখন হিন্দু বিদ্বেষী নবাব হোসেন সাহের কঠোর শাসনে তটস্থ। বিশেষ করে হিন্দুপ্রধান নদীয়ায় রাজভয়ে, রাজ অত্যাচারে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে রাজপ্রসাদ-আকাঙ্খায় অনেকে রাজধর্ম মুসলিমধর্ম গ্রহণ করছে। অবস্থাটা প্রায়—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

তাছাড়া হিন্দু যারা আছে, তারা সকলেই প্রায় কুসংস্কারপন্ন, জাতিভেদে বিভক্ত, ধর্মের নামে নানারকমের কুক্রিয়ায় মত্ত!

এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার মাটিতে উদয় হলেন এক মহা পুরুষ, পুরুষ-সিংহ, মত্ত সিংহ যেন। নদীয়ার গঙ্গার তীরে তৎকালীন মহানগরী নবদ্বীপে দেখা দিলো এই নব-সূর্যের। নদীয়ার জ্ঞানী গুণী ধর্মভীরু ও সমাজ হিতৈষীরা সবিস্ময়ে দেখলেন নবদিগন্তে আশার অরুণ-আলো। চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করলেন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ কালে হরিনাম ও শঙ্খঘণ্টা ধ্বনির মাধ্যমে। তারিখ ১৪৮৬-র ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

নিমাই জন্মগ্রহণ করলেন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীমাতার কোলে, নিম গাছ তলে। যিনি ভবিষ্যতে হবেন নিমের মতই উপকারী, সর্বরোগ হর, অথচ অনেকের কাছেই নিমের মতই তিক্ত—তাঁর যোগ্য জন্মস্থান বুঝি নিমগাছের তলদেশ।

নিমাই শশীকলার মত যতই বাড়তে লাগলেন ততই দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। এক এক সময় দুর্বোধ্য ও হতে লাগলেন! দেখে বাপ জগন্নাথ মিশ্র মুসড়ে পড়লেন, শচীমাতার মনে দেখা দিলো অনুশোচনা। হায়, কাকে পেটে ধরলাম।

অথচ চাঁদের মত ছেলে, গৌরবর্ণ, একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো ভ্রূর নীচের দুটি পদ্ম আঁখি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়!

অধর অরুণ আর চারু গণ্ডজ্যোতি।
সুন্দর শ্রীবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি॥
সিংহগ্রীবা গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥

(চৈ-ম-আদি খ:)

একদিন তো এক কাণ্ড করে বসলেন নিমাই। 'একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়॥' মানে ছেলের ভয় ডর নেই।

আবার 'গুণ' ও দেখা দিচ্ছে ক্রমেই। প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে চুরি করে খেতেও শিখেচেন। 'কারো ঘরে দুগ্ধ দিয়ে কারো ভাত খায়। হাণ্ডী ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥' অর্থাৎ শুধু চুরি নয়, ডাকাতিও। তার মানে জাত-টাতের বিচার নেই, আর না পেলেই রাগ। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ ও লক্ষ্যবস্তুর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবারই পূর্বাভাস বুঝি!

ছেলের চাঞ্চল্য দূর করবার জন্যে বাপ জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে স্বস্ত্যয়ন করালেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। শচীমাতা ভাবলেন, ছেলেকে নিয়মিত গঙ্গাস্নান করালে হয়তো শুধরে যেতে পারে। তাও হলো না। স্নান করে ফেরবার পথে নোংরা ঘেঁটে যান ইচ্ছে করেই: 'খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়। ত্যক্ত-ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়॥'

তবে দেখা গেল লেখাপড়ায় নিমাইয়ের খুবই মন। হাতে খড়ির পরেই দেখা গেল নিমাই লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি করচেন। 'কতদিনে মিশ্র পুত্রে হাতেখড়ি দিল। অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥' ভবিষ্যতে মহা-পণ্ডিত হতে হবে তো!

অবশ্য দুষ্টুমিও সমান তালে, না, বরং বাড়তেই লাগলো। দল পাকিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যান আর জ্বালাতন করে মারেন পুণ্যার্থী স্নানার্থীদের। তাঁরা এসে জগন্নাথ মিশ্রের কাছে নালিশ করেন—

শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অন্যায় কহি সব॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥

কেহ বলে সন্ধ্যা করি, জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করায় বদল।
পরিবারে গেলে সভে লজ্জায় বিকল॥

গঙ্গাস্নানে এসে মেয়েরাও নিমাইয়ের হাতে নাকাল হয়। শচীমাতার কাছে তাদের নালিশ—

স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকরার ফল দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে—মোরে চাহে বিভা করিবারে॥

(চৈ-ভা-আদি ৫ অ)

নানাজনের নানারকমের নালিশে বাপমায়ের কান ঝালাপালা। 'পোড়া' ছেলের জন্যে পড়োশীরা উত্যক্ত, পাড়া তোলপাড়, শুধু তাই-ই নয়, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও ইয়ার্কি! যিনি যৌবনে যোগী হবেন তাঁর পক্ষে এহেন রসিকতা আর কিছু নয় স্বতস্ফূর্ত স্ফুর্তি, অসংকোচের কিঞ্চিৎ নমুনা!

বাপ-মা ছেলেকে বকে মেরেও সায়েস্তা করতে পারেন না। ছেলের দুষ্টুমি বাড়তেই থাকে। তাও এক নয়, দল পাকিয়ে দুষ্টুমি। দলের সর্দার নিমাই নিজে। যিনি ভবিষ্যতে করবেন দুষ্টের দমন, যাঁরা শিষ্টাচারে দুর্জন ছাড়বে দুষ্টাচার, আশ্চর্য, তিনিই কিনা দুষ্টের শিরোমণি। তবে হ্যাঁ, আজকের দলের সর্দার হলেন ভবিষ্যতে তিনিই হলেন বৈষ্ণব ধর্মের নেতা হোতা প্রতিষ্ঠাতা ধর্মগুরু! হিন্দু সমাজ সংস্কারক! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!

এযেন মহাভক্ত, মহাপণ্ডিত, মহা-পুরুষ মহাপ্রভুর দুষ্ট-সরস্বতীর কাছে হাতেখড়ি। সেই দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হওয়া!

তবে দুষ্কর্মের জন্যেও দুঃসাহস দরকার। দুষ্কর্মও ভীরুর কর্ম নয়, সৎকর্মও নয়। কবির কথায় 'ওরে ভীরু, তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার।' ভবিষ্যতে ভুবনের ভার

যিনি নেবেন, হার যাতে না মানতে হয় তাই চলতে থাকে সর্বত্র প্রাথমিক জয়ের সাধনা।

এমন যে দুরন্ত ছেলে নিমাই হঠাৎ গেলেন বদলে। কারণ তাঁর বড় ভাই বিশ্বরূপ। শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে তাঁর ঠাহর হলো সংসার অলীক, জগৎ মিথ্যা। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। তাতে বাপ-মা দুঃখে মুসড়ে পড়লেন। দাদাকে ভালবাসেন নিমাই, তাঁর ছোট্ট বুকে বড় রকমই আঘাত লাগলো।

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে॥
খেলা সমবরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥

(চৈ-ভা আদি ৬ অ)

কিন্তু বাপ ভাবলেন, এ ছেলেও বুঝি শেষে শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সংসার ছাড়বে। তাই একদিন নিমাইকে ডেকে মিশ্র মশায় বললেন, বাপ, তুই আর লেখাপড়া করিসনে, আমাদের যা আছে তাতেই আমাদের কোনরকমে চলে যাবে। দেখলি তো তোর দাদার কাণ্ডটা!

শুনে নিমাই কিছু বললেন না। বইপত্র তাকে তুলে রাখলেন। শুরু করলেন আবার পাড়া মাতানো, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে এর বাগান ওর বাগান তছনচ করা।

সেদিন জগন্নাথ মিশ্র বাড়ি নেই, বাইরে কাজে গেচেন। নিমাই কথা নেই বার্তা নেই কুয়োতলায় নৈবেদ্য এঁটো হাঁড়িগুলোর মাঝে বসে রইলেন। রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে ছেলের ঐ কাণ্ড দেখে গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে মা বললেন, হ্যাঁরে নিমাই, ওকি কাণ্ড! ওখানে বসে কেন? জানিস ওসব এঁটো হাঁড়ি, ছুঁলে স্নান করতে হয়? ওখান থেকে চলে আয় বাপ! ছেলে দিলেন স্পষ্ট জবাব 'মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল-মন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥' খবর পেয়ে পাড়াপড়শীরাও বাড়িতে এসে জড়ো হলো। সব শুনে বললো, সে কি গো নিমাইয়ের মা, ছোট ছেলেরা তো জানি পড়তেই চায় না। আর তোমাদের ছেলে পড়তে চায় বলে পড়া বন্ধ করে দিয়েচো? এমন কাণ্ড তো বাপু আমরা কোনোকালে শুনিনি!

জগন্নাথ মিশ্রও বাড়ি এসে শচীমাতার কাছে সব শুনলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে

থেকে বললেন, তবে তাই হোক। আবার পড়ুক নিমাই। তারপর যা থাকে কপালে হবে। 'পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে। হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বিশেষে॥'

আমরা আজও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছি, Adult education-এর কথা ভাবছি, কত রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করছি, আর এই মহা-পুরুষটি সেই পাঁচশো বছর আগে প্রথম যৌবনেই বুঝেছিলেন, শিক্ষাছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ হয় না।

ক্রমে নিমাই হলেন মহাপণ্ডিত! পাণ্ডিত্যে তাঁর খ্যাতি নবদ্বীপে, নবদ্বীপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। আমরা জানি বিদ্যাং দদাতি বিনয়ম। কিন্তু বিদ্যা যে মনে অহংকারও আনতে পারে সে ইঙ্গিতও দিলেন তিনি তাঁর আচরণের মাধ্যমে। তিনি সকলকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতে লাগলেন। 'প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন। আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥'

ভাবি মহা-পুরুষদের পক্ষে এই আত্মবিশ্বাস বা আত্মম্ভরিতার দরকারও আছে। ভবিষ্যতে অন্যদের বশ করতে হলে নিজে অবশ হলে চলবে কেন? এ ক্ষেত্র 'অতি বড় হয়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে'—প্রবাদটা অচল। বরং বলা যেতে পারে 'অতি বড় হলে তবে ঝড়ে দাঁড়াতে পারবে।'—অবশ্য সত্যিকারের 'বড়' হওয়া চাই!

আমরা ভাবি Love at of first sight বুঝি আধুনিক ব্যাপার! প্রথম দর্শনেই প্রেম! আগেকার দিনে বিয়ের নামে 'পুতুল খেলা'য় কোনো প্রেম-ফ্রেমের ব্যাপার ছিল না, প্রেম frame হবার সুযোগই ছিল না। কিন্তু এই মহা-পুরুষটি তাঁর মহান জীবনে 'প্রথম দর্শনে'র প্রেম-পরশের আস্বাদ আমাদের করিয়েছেন। মনে রাখতে হবে পাঁচশো বছর আগেকার কথা। তখন পরনারী বা পরপুরুষের মেলামেশা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার, অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু নিমাই একদিন দেখলেন, নবদ্বীপেরই বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবী চলেছেন গঙ্গাস্নানে। দেখেই 'নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র। লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥' সেইদিনই গৌরচন্দ্র তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু বনমালীকে পাঠালেন মায়ের কাছে, যা, মায়ের কাছে গিয়ে ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়গে। বনমালীও ছুটলেন। শচীমাতা সব শুনে বললেন, 'পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর॥' বনমালী ভগ্নদূতের মত ফিরে এসে গৌরচন্দ্রকে বললেন ভাই আশা নেই।—শুনে গৌর আর কিছু বললেন না। বাড়িতে গিয়ে একসময়

হেসে মাকে জিগ্যেস করলেন, বনমালী এসেছিল নাকি? তা 'তারে সম্ভাষা ভাল না করিলে কেনে?'

মা বুঝতে পারলেন ছেলের ইঙ্গিত। মনেমনে খুশিও হলেন। পরদিনই বনমালীকে ডেকে পাঠিয়ে, পাঠালেন বল্লভ আচার্যের বাড়ি। আচার্য মশায় তো শুনে হাতে স্বর্গ পেলেন, তবে বললেন 'কন্য মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া। এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥' ছেলের যখন ঐ মেয়েই পছন্দ তবে শচীমতা কেন অমত করবেন? মত দিলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো।

একেত্রে গৌরচন্দ্র দেখালেন, পাত্রের ইচ্ছা থাকলে অভিশপ্ত বরপণ প্রথাও রদ করা যায়! কিন্তু আজকের পাত্ররা প্রেম করতে পটু কিন্তু বিনাপণে প্রেম-পাত্রীকে পত্নী করবার পাত্র নয়! আশ্চর্যের কি? মহা-পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব কাপুরুষের কাছে তা আশা করা অন্যায়।

যাকে ভালবেসে বিয়ে করলেন, সেই লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে মাত্র দু'বছর ঘর সংসার করতে পারলেন। এই সময়ের মধ্যেই নিমাই শ্রীহট্টে গেলেন অধ্যাপনা করতে—অর্থ উপার্জন করতে। নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ীকে জয় করে তখন তাঁর খ্যাতি সর্বদিকব্যাপী। কিন্তু তখনও ঈশ্বরে তেমন বিশ্বাস নেই। লোকে বলাবলি করে—'মনুষ্যে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই। কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥'

অথচ ইনিই একদিন উন্মাদের মতই ঘুরবেন, হায় কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ! এঁরই কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে দেখা গেল শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।

গৌরচন্দ্র শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর অর্থ, উপহার ইত্যাদি নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের রঙ্গ করে শোনালেন, শ্রীহট্ট বাসীদের কথার ধরণ। কিন্তু পরে শুনলেন, মর্মান্তিক সংবাদ—তাঁর লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেচে। শুনে গৌরচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে মাকে সান্ত্বনা দিলেন

ভবিতব্য যা আছে তা খণ্ডিবে কেমনে।
এইমত কাল গতি কেহ কার নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥

(চৈ-ভা / আদি—১২ অ)

অর্থাৎ মহা-পুরুষরা নিজের দুঃখ নিজের মনেই গোপন রাখেন। তাঁরা আসেন মানুষের মনের দুঃখ দূর করতে, তাঁদের সান্ত্বনা দিতে, নিজেদের দুঃখ জানাবার জন্যে আসেন না।

তক্ককতাকেও কোন দিনই প্রশ্রয় দেননি এই গৌরচন্দ্র। দ্বিতীয়বার গৌরচন্দ্রের যখন বিবাহ হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে, তখন বিবাহের সব খরচ বহন করলেন তাঁরই ভক্ত বিত্তবান বুদ্ধিমন্ত খান। হলো এলাহি কাণ্ড। দান ধ্যান হলো বহুত। ব্রাহ্মণদের সুগন্ধী, চন্দন, পান, দিব্যমালা দেওয়া হলো। লোভী ব্রাহ্মণরা ভিড়ের মধ্যে দু'তিনবার করে নিতে লাগলেন। কিন্তু গৌরচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ানো গেল না। তিনি তাই দেখে নির্দেশ দিলেন, সব ব্রাহ্মণকে তিনবার করে এসব দেওয়া হোক। 'পাছে কেহো চিনিয়া বিপ্রকে মন্দ বলে। পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥'

আমরা মহাত্মাজীর 'হরিজন' আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু এই মহাত্মা পাঁচশো বছর আগেই এই হরিজন আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, আচণ্ডালে দিয়েছিলেন কোল। যবন হরিদাস পেয়েছিলেন এই মহাপুরুষ মহাপ্রভুর স্নেহ-আশীর্বাদ!

তাই দেখি সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ নিমাই-পণ্ডিত যাচ্ছেন তাঁতীর বাড়ি, গোয়ালার বাড়ি, মালাকার, তাম্বুলীর বাড়িতে। তাদের ঘরে বসচেন, গল্প করচেন, শুধু তাই নয়, গোয়ালার ঘরে গিয়ে লাফ দিয়ে কারোর কাঁধে চেপে বসচেন, নিজের লোকের মতই বলচেন, দুধ দই ক্ষীর ননী কি আছে খাওয়া! তারাও তাঁকে 'মামা' বলতে অজ্ঞান।

অর্থাৎ সেদিনকার সংস্কার-বদ্ধ সমাজকে দেখালেন, আজকের আমাদেরও দেখালেন সত্যিকারের কমিউনিজম কাকে বলে! গোয়ালার ঘরে দুধ দই খেলেন, তাঁতীর ঘরে ধুতি-শাড়ি নিলেন, মালাকারের ঘরে মালা নিলেন, তাম্বুলীর ঘরে পান সুপুরি নিলেন, কিন্তু স্পষ্টই বললেন টাকা পয়সা দিতে পারবো না কিন্তু! মানে, তোদের যা পার্থিব সম্পদ আছে দে, আমার যা আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে তোদের দিচ্ছি। আয় এই পরম লেনদেন করি। 'শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যেই মধুপুরী করিলা ভ্রমণ। সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥'...এমন লেনদেন আজকের স্বপ্নাতীত ব্যাপার। Arm chair Politician-দের কাছে অচিন্ত্যনীয়।

খোলা-বেচা শ্রীধর গরীব মানুষ, খোলা বেচে খায়। সেখানে নিমাই পণ্ডিত পয়সা দিয়েই তার জিনিস কেনেন। তবে তার সঙ্গে মজা করবার জন্য দর কষাকষি করেন, বলেন তোমার টাকা মাটিতে লুকোন আছে, তুমি ইচ্ছে করে গরীব সেজে থাকো। অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের অতি সাধারণ একটি লোকের সঙ্গে রসিকতা করতেও বাধে না। বাধবে কেন? যে মহা-পুরুষ ভবিষ্যতে জনগণকে আপন করবেন, জনগণকে বশ করবেন, ভক্তিরসে পাগল করবেন, তাঁকে তো জনগণেরই একজন হতে হবে।

'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র চালাকি এসব ক্ষেত্রে চলে না, তা এই মহাপুরুষটি জানতেন।

শুধু তাই নয়। সাধারণ লোকের সঙ্গে এই মহা-পুরুষের অবাধ মেলামেশার জন্ম সেদিন হিন্দুধর্মও রক্ষা পেয়েছিলো। বর্ন হিন্দুদের অবহেলায় অত্যাচারে তথাকথিত নিম্ন জাতির হিন্দুরা ক্রমে হয়ে উঠছিলো অতিষ্ঠ, ক্ষুব্ধ। অনেকেই সমাজের অত্যাচারে অবিচারেহিন্দুধর্ম ছেড়ে জাতিভেদ-হীন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিলো। এমন দিনে তারা দেখলো, না, এমন একজন মানুষের মত মানুষ আছেন, যিনি মানুষকে মানুষ বলেই মনে করেন এবং তিনি যে-সে লোক নন, একজন মহাপণ্ডিত, হিন্দু, ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল নীতিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদ ঘোষণা করলেন, তা হচ্চে—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥
(চৈ-ভা / মধ্য-অ)

মহাপ্রভুর এই মহা-অবদান আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি কিনা সন্দেহ।

এই উদার-মনা মানুষটিই আবার দরকার মত রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। মহা-পুরুষ হলেন পুরুষ-সিংহ।

শ্রীবাসের বাড়ির অঙ্গনে সংকীর্তন হয়, শব্দে রাত্রে ঘুমোন যায় না, পাষণ্ডীরা এই নালিশ করলো কাজীর কাছে। সহরে রটেও গেল, কাজী নৌকো পাঠাচ্ছেন শ্রীবাসকে ধরবার জন্মে। শ্রীবাস ভয় পেলেন। দেখে নিমাই পণ্ডিত রুখে দাঁড়ালেন। 'ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও। শুনি তোমা ধরিতে আসে রাজ নাও॥' প্রভু অভয় দিলেন, যদি সত্যিই তোমাকে ধরতে আসে, 'মুই সর্ব আগে গিয়া নৌকায় চড়িমু॥ সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার। মুই সেই মুই সেই বোলে বারবার॥'

এখানে কোন বৈষ্ণব বিনয় নেই, অহিংস বাণী নেই। রীতিমতই আত্মঘোষণা, মুই সেই, মুই সেই, আমিই সেই! আমিই ভগবান! দুর্বলকে বরাভয় দিতে গেলে, তার মনে বিশ্বাস জাগাতে, এমনই দৃঢ় এবং রূঢ় হতে হয়!

জগাই-মাধাই উদ্ধারেও দেখি, পাপিষ্ঠ মাধাই যখন প্রভু নিত্যানন্দকে আঘাত করলো, তখনও নিত্যানন্দ দুবাহু বাড়িয়ে মাধাইকে আলিঙ্গন করতে গেলেন, বললেন, মেরেছ কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না? কিন্তু মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের কপালে রক্তধারা দেখে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, সর্বজনে দয়া প্রেম-ফ্রেম ভুলে গেলেন—

রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জাগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥

আমরা যদি এই ঘটনাকে অলৌকিক বলেও মনে করি, তবুও এটি ঠিক, মহাপ্রভুর ঐ রকম রুদ্রমূর্তি দেখে দুই পাষণ্ডের ভীরু মনে ভয় দেখা দিলো। এতদিন তারা তাদের ভয়ে ভীত চকিত আর্ত মানুষকেই দেখেচে, তা দেখেই অভ্যস্ত তারা। আজ তাদের সামনে উল্টো বিপত্তি! রুদ্র, ভীষণ মূর্তিতে এক মহাপুরুষ, পুরুষ-সিংহ দণ্ডায়মান। বহু পাপে পাপী দুজনের ভীরু মনে দেখা দিলো আশংকা, তারা ভয়ে আত্মসমর্পণ করলো। তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে মহাপ্রভু তাদের বুকে শ্রীচরণ তুলে দিলেন। দুষ্টের কাছে অশিষ্ট উপায়, দুষ্টকে শিষ্ট করবার উপায়।

প্রভু বলে আর তোরা না করিয়ো পাপ।
জগাই-মাধাই বলে আর না রে বাপ॥

এক জাতীয় তথাকথিত ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ প্রচারে ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির বিরুদ্ধে জ্ঞানী-গুণী মহাপুরুষরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন আমাদের যুগেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁর সংসারী ভক্তদের, সংসার কর, তবে সময়মত একটু ঈশ্বরের নাম করিস—মনে, কোণে বা বনে যেখানেই হোক। তাতেই হবে। তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ঘণ্টা নাড়া বন্ধ রেখে মনটাকে তৈরি কর্, স্বাস্থ্যটাকে তৈরি কর্। তাহলেই সব হবে।

আর পাঁচশো বছর আগে যুগ বুঝে তখনকার যুগাবতার মহাপ্রভু প্রচার করলেন, এক সঙ্গে মিলেমিশে কৃষ্ণনাম কর্, সংকীর্তন কর্। সব জাতের মানুষকে এক করবার একমাত্র উপায় একসঙ্গে সংকীর্তন করা—সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক শ্রীগৌরচন্দ্র তাই দিলেন এই বিধান! একদিন প্রকাশ্যে সকল বৈষ্ণবকে মন্ত্র শোনালেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।

(চৈ-ভা / মধ্য—২৩ অ)

একবার শ্রীবাসের বাড়িতে গৌরচন্দ্রের অভিষেক হলো সাড়ম্বরে। এ অনুষ্ঠান সর্বসম্মতিক্রমে গৌরচন্দ্রের বা শ্রীগৌড়চন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ। তিনি বেদীতে সুসজ্জিত হয়ে বিরাজ করচেন। নিত্যানন্দ তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছেন, অদ্বৈত জোড়হাতে স্তবপাঠ করচেন। চারধারে ভক্ত পার্ষদরা ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে আছেন। গৌরচন্দ্রের নির্দেশমত তাঁর অভিষেক গীত গাওয়া হচ্চে। গৌরচন্দ্রেরই ইচ্ছামত তাঁকে নানাবিধ মিষ্টান্ন খাওয়ানো হচ্চে! এই সাড়ম্বর রাজকীয় অনুষ্ঠানে গৌরচন্দ্রের মনে পড়লো গরীব খোলা-বেচা শ্রীধরের কথা। এত গণ্যমান্য ভক্তবৃন্দের মধ্যেও সেই অবহেলিত সহজ সরল মানুষটির কথা। হুকুম হলো, ডেকে আনো তাকে। শ্রীধর এলো, প্রভু হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে কত দর কষাকষি করেচি, কিন্তু দেখচো তো আমার ঐশ্বর্য! শ্রীধর হতবাক, স্তম্ভিত। সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, দেখচি তো। কিন্তু আমি কি বলে তোমার স্তব করবো? 'কোন স্তুতি জানো মুঞি কি মোর শকতি।' শুনে 'প্রভু বলে তোর বাক্য সেই মোর স্তুতি॥' মানে, স্তব করবার জন্যে বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার নেই, সংস্কৃত শ্লোক জানবার দরকার নেই। প্রাণের আকুতিই বড় কথা, ভক্তি থাকলেই হলো, ভাষার কারুকার্যের দরকার নেই। ভক্তির এই সহজ ব্যাখ্যা তখনকার দিনে বড় সহজ ছিল না! আর এই মহাপুরুষের উদারতাও লক্ষ্য করবার। কী দরকার ছিল ঐ গরীব খোলা-বেচা শ্রীধরকে ডাকবার।

সন্ন্যাস নেবার আগের দিনও এই গরীব ভাগ্যবান শ্রীধরকে কৃতার্থ করেছিলেন মহাপ্রভু। গৌরচন্দ্র বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন, এমন সময় লাউ হাতে শ্রীধর এসে উপস্থিত, ঠাকুর তোমার জন্যি গাছের এই লাউটা আনিছি। সঙ্গে সঙ্গে গৌর-চন্দ্রের একগাল হাসি, হ্যাঁরে, তুই কি করে বুঝলি আমার লাউ-এর পায়েস খেতে ইচ্ছে হয়েছিল আজ! শচীমাতাকে ডাকলেন, মা, শ্রীধরের এই লাউ দুধ দিয়ে ভাল করে পায়েস রেঁধে দাও, খাবো।

অথচ পরদিনই ভোরে তিনি সংসার বন্ধন ছিন্ন করবেন, সন্ন্যাস নেবেন।

আশ্চর্য, কোমলে-কঠোরে তৈরি এই মহাপুরুষটি। তাই তাঁর সংকীর্তনে পাষণ্ডীরা যখন কাজীর কাছে আবার নালিশ করেছিলো, তখন তিনি সদলবলে কীর্তন করতে করতে চললেন কাজীর বাড়ির দিকে। সারা নবদ্বীপ তাঁর নেতৃত্বে যোগ দিলো সংকীর্তনে।

নালিশ শুনে 'কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥' কাজীর এই ঘোষণা শুনে গৌরচন্দ্র হলেন ক্ষিপ্ত। আমার কাজে বাধা দেওয়া!

প্রভু বলেন নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখি আজি কাজির পোড়াও ঘরদ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥

(চৈ-ভা / মধ্য—২৩ অ)

এবং দেখা গেল—

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বারবার॥

পরে লোক পাঠিয়ে কাজীকে ডেকে আনলেন—

দূর হইতে এলা কাজি মাথা নোয়াইয়া।
কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥

(চৈ-চ / আদি—১৭ অ)

পুরুষ সিংহ গৌরচন্দ্র প্রতাপশালী কাজীকে ঘেরাও করেছিলেন, তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং অন্যায়ের প্রতিকার করেছিলেন। এমনি ছিল এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সংগঠন-শক্তি! এই ঘটনায় বোঝা যায়, আজকের ঘেরাও আজকের নয়!

এহেন পুরুষ-সিংহের শক্তির মোহ নেই, গদীর মোহ নেই। পার্ষদ ভক্তদের হাতে বৈষ্ণব-ভক্তদের ভার দিয়ে সাধের নবদ্বীপ ছেড়ে, সংসার বন্ধন ছিঁড়ে যৌবনে যোগী হলেন, সন্ন্যাস নিলেন। বয়েস তখন মাত্র চব্বিশ।

অথচ তিনি তখন দ্বিতীয়বার বিবাহিত। প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া। মাতা জীবিতা।

মাতৃভক্ত মহাপুরুষ মাকে সান্ত্বনা দিলেন। মা, তুমি জন্মে জন্মে আমার মা ছিলে, এ জন্মেও তাই, ভবিষ্যতেও আমারই মা হবে তুমি। তোমার সব ভার আমার। যখনই আমাকে মনে করবে আমার দেখা পাবে।

কিন্তু প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া? লোচন দাসে পাই সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে তাঁকেও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, বৃন্দাবন দাস এ বিষয়ে নীরব। তবে পরে এসে তাঁর কাষ্ঠ-পাদুকা বা খড়ম জোড়া দিয়েছিলেন নিত্যপূজার জন্যে। মহাপুরুষদের সতী-সাধ্বীরা এমনি করেই ভোগ করেন বিরহের শাস্তি। পতির পুণ্যেই তাঁদের পুণ্য। সীতা-সাবিত্রীই হন তাঁদের আদর্শ।

গৃহ ছেড়ে যাবার সময় শচীমাতা ছেলেকে বললেন, বাবা, একটা কথা রাখো। তুমি নীলাচলে থাকো।

সংসার ত্যাগী পুত্রকে এই অনুরোধের কারণ ছিল। তখনকার দিনে অনেকেই গৌড় থেকে পুরীতে পায়ে হেঁটে সদলবলে জগন্নাথ দর্শনে যেতো। মায়ের আশা তাদের কাছেও অন্তত ছেলের খবরাখবর পাবেন।

গৌরচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল শ্রীবৃন্দাবনে যাবার—শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিতে। কিন্তু মাতৃভক্ত পুরুষ প্রধান মায়ের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। বললেন, তাই হবে মা।

অথচ কর্তব্যে কঠিন কঠোর এই মহাপুরুষটি তাঁর এই মায়েরই বৈষ্ণব-অপরাধে অদ্বৈত আচার্যের কাছে ক্ষমা চাইয়েছিলেন। অদ্বৈতের কাছে যাতায়াত করায় শচীমাতা শুধু আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, এই অদ্বৈতের সঙ্গে মিশে তাঁর বড় ছেলে বিশ্বরূপ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েচে, এবার বুঝি এই অদ্বৈত তাঁর এই ছেলেটিকেও ঘরছাড়া করেন। ওঁকে লোকে 'অদ্বৈত' বলে কেন, উনি 'দ্বৈত'।

কিন্তু পরহিতই যাঁর ব্রত, বন্ধন-মুক্তির জন্যে সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্যেই যাঁর আবির্ভাব, তাঁর জীবনের পথে কোন বাধাই বাধা নয়। গৌরচন্দ্রের মন চাইলো সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি। তিনি কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে হলেন সন্ন্যাসী, নাম হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভাবাবেগে ভাবের ঘোরে রাঢ় দেশের নানা অঞ্চল ঘুরে শেষে চললেন নীলাচলের দিকে।

মায়ের ইচ্ছা, মায়ের অনুরোধ, অদ্বৈত আচার্য ও অন্যান্য ভক্ত পার্ষদদের নিষেধ সত্ত্বেও!

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান জীবন কাহিনী অল্প কথায় ব্যক্ত করা যায় না। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখবার চেষ্টার মতই তা অসম্ভব। তাই সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে সসংকোচে এই পুরুষ-সিংহের জীবনের ঘটনাবলীর আভাসমাত্র দিই—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-জীবনে প্রায়ই ভাবে উন্মাদ হচ্ছেন, কৃষ্ণবিরহে কাঁদচেন, চারদিকে খুঁজচেন 'হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ', কখনো বা আনন্দে নৃত্য করচেন, দূর থেকে জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া-দর্শনে গেলেন মূর্চ্ছা, দিশেহারা অবস্থায় কূপেও পড়ে গেলেন একবার।

কিন্তু যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেতেন, তখন তিনি অন্য মানুষ। কর্তব্য-কর্মে অবিচল, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়। তাছাড়া লোকশিক্ষা দিচ্ছেন, ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর স্বপ্নের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করলেন, মহারাষ্ট্রে গেলেন ধর্মপ্রচারে। পায়ে

হাঁটা পথ, সঙ্গে অন্তরঙ্গ কেউ নেই, একাই একশো তিনি। তাঁর পাণ্ডিত্যে, ভক্তি-শক্তি-শৌর্যে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বশ, উচ্চ রাজকর্মচারী রায় রামানন্দ, সুপণ্ডিত সার্বভৌম, গৌড়েশ্বর নবাবের দুই মন্ত্রী—পরে রূপ ও সনাতন প্রভৃতি বশীভূত, শরণাপন্ন। তর্কে তিনি তর্কাতীত। বলচেন 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

কুমোরের চাকার মত মহাপ্রভুর জীবন ঘুরপাক খাচ্চে:

কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্য স্ফুর্তি।
কভু বাহ্য স্ফুর্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

(চৈ-চ / অন্ত্য—১৫ শ)

দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও তিনি বৈষ্ণবধর্মের নীতিবাদও শোনালেন সনাতনকে, যা শিক্ষাষ্টক নামে বিখ্যাত—

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্যদের অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥

(চৈ-চ / মধ্য—২২ শ)

এ শিক্ষা কি শুধু ধর্ম-শিক্ষাই? এতো গৃহস্থের উপযোগী উপদেশাবলী!

এই সনাতনের সর্বগায়ে দুরারোগ্য ব্যাধি হলে প্রভু বিনা দ্বিধায় তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা প্রকাশে প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, 'দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাই ভক্তি বিনে॥'

এই মহাপুরুষ তাঁর অঙ্গীকার মত মূর্খ শূদ্র দরিদ্রকেই কৃপা করেননি, যবন হরিদাসকে দিয়ে হিন্দুধর্মও প্রচার করিয়েছেন। তথাকথিত 'সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে সর্ব্বনাশ। নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ॥'

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্টের মত বারবণিতাদের উদ্ধার করেচেন, মন্দিরে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেচেন, দস্যুদের সৎপথে এনেচেন, পরম বৈষ্ণব হয়েও ভক্তিভরে শিবপূজা করেচেন, করেচেন অষ্টভুজা পূজাও।

তবে বলিদানে বাধা দিয়েচেন। ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ভিন্ন দেশে গিয়ে চব্বিশ বছরের এই বাঙ্গালী যুবা-সন্ন্যাসীর ধর্ম-প্রচারের দুঃসাহসিকতা ও গুরুত্ব আজও আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারিনি।

এই বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের জন্যে তিনি নিত্যানন্দকে পাঠিয়েছিলেন গৌড়ে, আর রূপ ও সনাতনকে পাঠিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। গৌরাঙ্গ ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ বাংলাদেশের নগরে-গ্রামে, হাটে-মাঠে মনোহরবেশে কীর্তন-আবেশে প্রচার করতে লাগলেন, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ রে॥ আশ্চর্য, নিজের নাম প্রচারের জন্যে আখড়া খুলে বসলেন না।

এই মহাপুরুষ মহাপ্রভু, যিনি যবন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন, তিনিই কর্তব্যের খাতিরে ছোট হরিদাসকে করলেন সঙ্গ-ছাড়া। এই উত্তম কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসের অপরাধ, তিনি মহাপ্রভুর ভোজনের জন্যে শিখী মাহিতীর ভগ্নী মাধবী দেবীর কাছে 'শুক্ল চালু' বা ভাল চাল ভিক্ষা করে এনেছিলেন।

মাহিতী ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥...
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পার আমি তাহার বদন॥
আজি হৈতে আজ মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥
(চৈ-চ / অন্ত্য—২য়)

বেচারী মনের দুঃখে প্রয়াগে গিয়ে ডুবে মরলেন। কিন্তু কৃপাময় মহাপ্রভু এমন কঠোর হলেন কেন? হয়তো অন্য ভক্তদের সাবধান করবার জন্যে। পুরুষ ব্রহ্মচারী হলেও নারীর সংস্পর্শে আসা বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে মাধবী দেবী বৃদ্ধা তপস্বিনী পরম বৈষ্ণবী। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে তাই হবে তার নিশ্চয়তা কি? এই দূরদৃষ্টি মহাপ্রভুর ছিল। যেদিন থেকে তাঁর এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলো, সেদিন থেকেই দেখা দিলো বৈষ্ণব সমাজের অধঃপতন। হয়ে দাঁড়ালো 'ন্যাড়া-নেড়ির' আখড়া। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণ এই একই।

সকলের পক্ষে সব সয় না। সেজন্যে বিশেষ শক্তি থাকা দরকার। শক্তিধর মহাপ্রভুর সে শক্তি ছিল। তবু দেখি তিনি তাঁরই ভক্ত দামোদর পণ্ডিতের উপদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। এক উড়িয়া পিতৃহীন সুন্দর ব্রাহ্মণ কুমার প্রতিদিন

মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসতো, মহাপ্রভুও তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঐ বালকের মা ছিলেন বিধবা, সুন্দরী যুবতী, কাজেই দামোদর পণ্ডিত ঐ বালকের সঙ্গে প্রভুর বেশি মেলামেশা পছন্দ করলেন না। একদিন স্পষ্টই বললেন—

রাণ্ডী ব্রাহ্মণী বালকে প্রীতি কেন কর।
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥
(চৈ-চ / অন্ত্য—৩য়)

দামোদর পণ্ডিতের এই সাবধান-বাণীতে প্রভু রাগ করলেন না, করতেও পারতেন, বরং সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি দেখচি স্পষ্ট কথার লোক, আমাকেও বাক্য-দণ্ড দিতে ভয় করলে না। তুমি ঠিকই বলেচো।

আবার এই মহাপ্রাণ মহাপ্রভু আর এক উড়িয়া স্ত্রীলোককে যেভাবে জগন্নাথ দর্শন করালেন, তা রীতিমতই চমকপ্রদ! স্ত্রীলোকটি লোকের ভিড়ে জগন্নাথ দর্শন করতে পারছিলো না, শেষে একটা উঁচু জায়গা পায়ে ঠেকাতে তার উপরে উঠে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগলো, বুঝতেও পারলো না, মহাপ্রভু প্রণাম করছিলেন, তাঁর পিঠেই উঠে দাঁড়িয়েচে সে। প্রভুর সঙ্গী গোবিন্দ এই কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটিকে বকাবকি করতে যাচ্ছিলেন, প্রভু বাধা দিলেন। প্রভু—

যাবতকালে দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভু আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ে দেখে প্রভু স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥

কিন্তু স্ত্রীলোকটি পরে নিজেই বুঝতে পারলো, কি অপকর্ম করেচে সে। জিব কেটে ক্ষমা চাইতে লাগলো সে—

আস্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥

মহাপ্রভু বললেন, আহা, এই স্ত্রীলোকটির মত ভক্তি আকুতি আমাকে দিলেন না জগন্নাথ—

তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতা লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥…
আহা ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥

(চৈ-চ / অন্ত্য—১৪ শ)

প্রভু তাঁর নবদ্বীপ লীলায় শ্রীবাসের বাড়িতে অদ্বৈত আচার্যের সামনে অঙ্গীকার করেছিলেন কোন কলির জীবকে নিজের কাঁধে তুলে জগন্নাথ দর্শন করাবেন, প্রভু সেই প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

বিশ্রামের সময় শংকর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদসেবা করতো। এক রাত্রে পদসেবা করতে করতে শংকর পণ্ডিত তাঁর শ্রীপদের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লো। তখন শীতকাল। প্রভু উঠে তাঁর নিজের কম্বলখানি সযত্নে তার গায়ে ঢেকে দিলেন। 'উহার অঙ্গে পড়িয়া শংকর নিদ্রা যায়। প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥'

শেষ জীবন পর্যন্ত এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন মাতৃভক্ত। সন্ন্যাস জীবনেও তাঁর মায়ের কথা ভোলেননি। সন্ন্যাস নেবার আগে মাকে বলেছিলেন—

ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

(চৈ-ভা / মধ্য—২৭ শ)

এই মহান সন্ন্যাসী সে অঙ্গীকারও ভোলেননি। তাই প্রতি বছরেই তিনি তাঁর কোনো পার্ষদকে পাঠাতেন নবদ্বীপে, সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন মহাপ্রসাদ। এবং মাকে দিতেন সান্ত্বনা : এই কাজটি জগদানন্দকেই প্রায় করতে হতো। তাঁর মারফত মাকে আশ্বাস দিতেন—

নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥…
যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাতে ভোজন।
সেদিনে অবশ্য আমি করি যে ভক্ষণ॥…

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

এবং জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক পাঠান আর ভক্তগণে॥

এইভাবে মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥

(চৈ-চ / অন্ত্য—১৯ শ)

গৌড়দেশ থেকে ভক্তরা রথের সময় পুরী এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে চারমাস থাকতেন। কিন্তু আর থাকতে দিতেন না। তখন প্রভুর প্রায় বাহ্যজ্ঞান থাকতো, তার পরেই হতেন দিব্য-উন্মাদ। 'তা সবা সঙ্গে প্রভুর দিন বাহ্যজ্ঞান। তাঁরা গেলে পুনঃ হইল উন্মাদ প্রধান॥'

তখন সারা নীলাচলে ঘুরে বেড়াতেন 'হা কৃষ্ণ—কোথা কৃষ্ণ' করে। সেখানকার আকাশে-বাতাসে সাগরে-সৈকতে হয়তো দর্শন পেতেন শ্রীকৃষ্ণের।

কিন্তু আশ্চর্য, 'কৃষ্ণের জীব'দের প্রতি প্রভু ছিলেন আজীবন দয়া পরবশ। মহান সন্ন্যাসী হয়েও মহাপুরুষ মহাপ্রভু কর্তব্য কর্মে ছিলেন অবিচল, অচঞ্চল, অনমনীয়।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর আন্দোলন

রবীন্দ্র গুপ্ত

সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের মনে শ্রীচৈতন্য একজন মহান সাধক ধর্মগুরু ও রূপেই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। 'ইষ্টমন্ত্র'-এমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের দেবপূজায় গৌরবন্দনা অবশ্যকৃত্য। সেই সুবাদেই তিনি ক্যালেণ্ডারেও কালী, রাধাকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণের মতো নিতাই-সহ চিত্রিত। এ পর্যন্ত বোঝা সহজ। (শুধু নগরসংকীর্তনরত গৌরাঙ্গের কেন যে চাঁচর চিকুর, সেটুকু বোঝা যায়না।)

কিন্তু একবিংশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমরা শ্রীচৈতন্য আন্দোলনের কথা ভাবছি কেন? নিশ্চয় ধর্মের জন্য নয়; কারণ, বর্তমান শতাব্দী সব আন্দোলনের মতো ধর্মীয় আন্দোলনকেও আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে দেখে। ধর্মেরও মূল্যায়ন হবে সেক্যুলার দৃষ্টিতে। বিপিনচন্দ্র পাল দুটি জাগরণের কথা বলেছেন, একটি ষোড়শ শতকের, অন্যটি উনিশ শতকের। প্রথমটি, তাঁর মতে, প্যান-ইসলামিক রেনেশাঁস, দ্বিতীয়টি প্যান-ইউরোপীয়। চৈতন্য আন্দোলনকে স্পষ্টত তিনি ইসলাম-প্রভাবিত বলেই নির্দেশ করেছেন। ষোড়শ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির উজ্জীবন অবশ্যই 'শাহী' সুলতান আমলের রাজনৈতিক নিরাপত্তা, শান্তি ও ধর্মীয় উদারতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মোগল-প্রশাসনের তুলনায় পাঠান-প্রশাসনে বাংলার রায়ত, গরীব চাষী ও বাগালরা অনেক বেশি অধিকার ভোগ করত, বহু আর্থিক 'ছাড়' পেত। কিন্তু এসব তো বাইরের ব্যাপার। চোদ্দ শতকেই এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেছে, পনের শতকের রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ত ঢালাও উদারতা দেখিয়েছেন। তাতেই বা 'জাগরণ' হল কোথায়? আসলে উজ্জীবন একটা ঝোঁক, কিছু হয়ে ওঠার সদর্থক আকাংক্ষা ভেতরে থাকা চাই। বর্ষার জলসেকে যেমন বীজ থেকে নবাংকুর উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। প্রেরণার চাপটা আসে ভেতর থেকেই। সে মনন ও প্রেরণার চাপ এলো চৈতন্য-আন্দোলন থেকে। অনেক

কবি গায়ক পণ্ডিত যেমন উঠে-পড়ে লাগলেন, তেমনি নতুন শ্রোতা-অনুরাগী-গ্রহীতার দলও তৈরি হল। এইভাবে নতুন চেতনার জাগরণ শান্তিপুর-নবদ্বীপ থেকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং আসাম পেরিয়ে মণিপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের ধর্মীয় 'কণ্টেণ্ট' মহান্তদের কাছে মূল্যবান, তার সেক্যুলার ইমপ্যাক্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাসের ছাত্রের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

ক. শ্রীচৈতন্য-ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য

'পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম'—এই মানদণ্ডে দেখা যায় পৌরাণিক সংস্কারে বিশ্বাসী হিন্দু বাঙালী স্মৃতির বিধিনিষেধ মান্য করতেন। সুতরাং বর্ণ-জাতির বৈষম্য সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না; জন্মসূত্রেই ঈশ্বরবিহিত পার্থক্য সুনির্দিষ্ট এবং সকলেই তা মেনে নিয়েছিলেন। সব পুরাণের উপসংহারে একটি কলিকাল চিত্র আছে। বৈষ্ণব, শৈব ও শক্তিপুরাণের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য সত্ত্বেও এই ব্যাপারে ঐক্য আছে। কলিকালে পাপের ভরা পূর্ণ হবে, সব রকম অনাচার ব্যভিচারে দেশের নরনারী লিপ্ত হবে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে-ভবিষ্য সন্ততির পারলৌকিক কর্মে আমার আত্মার শান্তি ও সদ্গতি, তারা পাপাচারী হবে। সে বড়ই দুর্লক্ষণ এবং ভবিষ্যতের ছবিটিও নৈরাশ্যের গাঢ় কালো রঙে আঁকা। সুতরাং আতংকজনকও।

এই ভীতি থেকে মুক্তি দিলেন শ্রীচৈতন্য। সেজন্যই কবিকণ্ঠে প্রশস্তি শোনা যায়, 'জয় শচীনন্দন রে। / কলিযুগ কাল ভুজগভয় খণ্ডন রে।' কিংবা 'কলিযুগ মত্ত-মাতঙ্গমরদনে কুমতি করিণী দূর গেল'। ভয়ের ভয় ভাঙানো বড় কঠিন কাজ। 'প্রণমহোঁ কলিযুগ' শুধু নয়, কলিযুগই 'সর্বযুগসার'। এই উক্তি যেন জীবনকে দেখার দৃষ্টিকেই বদলে দিল। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যদি ঈশ্বরনিবেশ থাকে, এবং পূর্বের সঞ্চিত কোন জ্ঞানে পরের যুগ সমৃদ্ধ হয়, তাহলে কলিকাল তো নিকৃষ্ট হতে পারেনা। পূর্বের তিন পর্যায়ের সত্য (ভাগবত) ব্যর্থ হবে কি করে? সুতরাং নৈরাশ্য, নাস্তিক্য, সংশয় নয়, বিশ্বাসের শেকড়কেই তিনি মনের মাটিতে শক্ত করে গেড়ে দিলেন। রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ ও বিশ্বম্ভর—তিন সমকালীন বিপ্র সময়ের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। পুণ্যফল, পরকাল ও ঈশ্বর-সামীপ্যের লোভ দেখিয়ে বিধি-নিষেধের বেড়া রঘুনন্দন আঁট করে বেঁধেছেন। তাঁর অষ্টবিংশতি তত্ত্ব এবং তার বিবিধ ভাষ্যটীকা, 'মূর্খ বিপ্রে'র ব্যাখ্যায় তার আক্ষরিক উদ্‌যাপন দেশের মানুষকে ক্লীব, অনুষ্ঠানক্লিষ্ট, প্রথাকীটে পরিণত করেছিল। কৃষ্ণানন্দ ও বিশ্বম্ভর দুজনেই বেড়া ভাঙতে চেয়েছেন, অন্তত বলা

যায় আল্‌গা করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল গুরুতর। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বৌদ্ধ তন্ত্র প্রভাবকেই ঢেলে সাজালেন। তাতে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে বিশেষ হেরফের হয়নি—কেবল পশ্বাচারের প্রবণতা বেড়েছে। বিশ্বম্ভর ভক্তি ও যুক্তিকে মেলালেন। কলিকাল-বিচারে যুক্তির প্রয়োগ, যুক্তির দ্বারাই মানুষে মানুষে অভেদবুদ্ধি, আচারসাম্য, অস্পৃশ্যতা-অস্বীকার ইত্যাদি। ভক্তি জানাল, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।' ঈশ্বরে অধিকারীভেদ জাত-পাতের ব্যবধান পাকা করে রেখেছিল। চৈতন্য তারও বিষদাঁত ভাঙলেন। কায়স্থ নরোত্তম দাস, ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য, বৈদ্য নরহরি (সরকার), সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত, সদ্গোপ শ্যামানন্দ সকলেই মোহান্ত, সমান মর্যাদার অধিকারী। সন্ন্যাসী হবার আগেও বিশ্বম্ভর বন্ধুবর শ্রীবাসের বাড়িতে সমপ্রাণ সাথীদের নিয়ে জাতি নির্বিশেষে কীর্তনে মগ্ন হতেন। সন্ন্যাসী হবার পরে তাঁর ধর্মই হল অপ্রেমজয়ের।

খ. উচ্চবিত্ত বাবুদের 'আদর্শ নেতা', না জনগণের প্রিয় 'গৌর'

প্রশ্নটি এই, শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন কি আধুনিক অর্থে Elitist ছিল না ? তাঁর বিদগ্ধ পরিকর-গোষ্ঠীর অনেকেই সেকালের উচ্চশিক্ষিত এবং উঁচু রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। সুবুদ্ধি রায় সৈয়দ হুসেন খাঁর মনিব ছিলেন। তাই হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হয়ে তাঁকে বিশেষ মান্য করতেন। 'সাকর মালিক' সনাতন এবং রূপ গোস্বামী 'দবীর খাস' সুলতানের খুব প্রিয় ছিলেন। অনুপম বা বল্লভও সরকারী কর্মচারী ছিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি ছিলেন রাজবৈদ্য, তাঁর ভাই অনুপ ও ছিলেন সরকারী উচ্চপদের লোক। উদ্ধারণ দত্ত বর্ধমান জেলার ধনী বণিক পরিবারের সন্তান। নরোত্তমের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্য-ধর্মের প্রসার। উড়িষ্যার মহাবলী স্বাধীন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র শিষ্য হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম উড়িষ্যার রাজধর্ম হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠী, সামন্ত ও তাঁদের অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীরা চৈতন্যপন্থী হলেন। সেই ধারা মান্দারণ অঞ্চলের রাজা বীর হাম্বীর পর্যন্ত অনুসৃত। কেউ কেউ বলতে পারেন, কলকাতার শেঠ-বসাক এবং সুবর্ণ বণিক গোষ্ঠীও মূলত চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব। এঁরা কেউই সাধারণ শ্রেণীর লোক নন। বরং অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে এঁরা সামন্ত শোষণের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে জড়িত।

এইভাবে দেখলে চৈতন্য-আন্দোলনকে Elitist বলা যেতে পারে। রাজসভার কাব্যের অলংকার-ছন্দচাতুর্যও হয়ত বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই অভিজাত শ্রেণী সংস্পর্শেরই

ফল। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জের অন্যদিকেও আলো ফেলা উচিত। বিদ্যাপতি বলেছিলেন, 'কত বিদগধ জন / রস-অনুমগণ / অনুভব কাহু ন পেখ'। অর্থাৎ শাস্ত্র নিয়ে সবাই চুলচেরা তর্কে মেতে আছে, অনুভব বা উপলব্ধির গভীরতা তো দেখি না। তাহলে বিদ্যা-সর্বস্বতার সংকীর্ণতা, জীবনবিমুখতায় কেউ কেউ পীড়িত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতি দেখেছিলেন, আমাদের ইতিহাসের ছক বদলাচ্ছে। কীর্তিলতা-কীর্তিপতাকায় সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধির ছবি আছে। Elitist বা অভিজাত-প্রবণতা সত্য হলে যাঁদের নাম একটু আগে করা হল, তাঁরা বিষয়, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে আসবেন কেন? এ প্রশ্নতো সেকালেও উঠেছিল—

কৃষ্ণভক্তিতে তোমার হৈল কোন সুখ
মাগিয়া সে খাও আরো বাঢ়ে যত দুঃখ।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে পাত্রমিত্র সহ রাজার মতো বার দিয়ে বসতেন বা নিত্যানন্দ সাঙ্গপাঙ্গ সহ মল্লনায়কের মতো থাকতেন—এর দ্বারা আভিজাত্য প্রীতি প্রমাণিত হয় না। কারণ সামান্য মুখশুদ্ধি বা স্নানের আগে তেল-মাখার আরামকেই তো চৈতন্য বর্জন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীরাও 'নিষ্কিঞ্চনতা' অভ্যাস করতেন। দৈন্য তাঁদের কাছে শ্রেয়সের মর্যাদা পেয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য কতদূর নীচের তলায় চারিয়ে যেতে পেরেছিলেন? বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য ভক্তদের একটি তালিকায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, তিলি ইত্যাদি জাতি বর্ণ নির্দেশ করেছেন। তার সঙ্গে রিজলে সাহেবের সমীক্ষণও মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এমনকি সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায়:

তপশিলী উপজাতি

কোরা	২০,৫৪,০৮১	রাধা-কৃষ্ণ পূজক
মহালী	২৮,২৩৩	দোল-উৎসব পালন করে
সুন্দরবনের ওঁরাও—		হরিপূজক

তপশিলী জাতি

রাইতি	৮২৬৯	বৈষ্ণব
ভুঁইমালী	৩৯১৮১	কৃষ্ণপূজক
ধোপা	১৫৪৭৯১	বৈষ্ণব
দোয়াই	১৪১৯১	ঐ
ডোম	১৫১৮১৮	ঐ

গোনরি	১৩৮৫৯	ঐ
জালিয়া কৈবর্ত	১১৭৩৮৪	ঐ
মালো	৬৮৭৫৭	বৈষ্ণব
কাঁদরা	২৫৪৩০	ঐ
পোদ	৮৭৫৫২৫	ঐ
রাজোয়ার	৪১১৩৩	ঐ
শুঁড়ি	১০৬৮৭০	ঐ
তেওড়	৩৯৬৩৩	ঐ

শ্রীহট্টের ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বৈষ্ণব—

উত্তর শ্রীহট্ট	৭৫৬৬
করিমগঞ্জ	১২৩,২৮৩
মৌলভীবাজার	৬,১৮৪২
হবিগঞ্জ	১৩২৮৪৫
সুনমগঞ্জ	১৪৬,১৯৩

একেই তো 'Grassroot level'-এ চারিয়ে যাওয়া বলে।

গ. শ্রীচৈতন্য : ব্যক্তিজীবন

উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্ট, সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে বসতি করেন জগন্নাথমিশ্র। তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন; নতুবা বহিরাগত মানুষ নবদ্বীপের বিদ্বৎসমাজে ঠাঁই পেলেন কি করে? বিশ্বরূপ প্রায় নিত্যানন্দের বয়সী; তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বিদেশেই দেহ রাখেন। নিরুদ্দিষ্ট সেই ছেলের চেয়ে বছর দশেকের ছোট বিশ্বম্ভর। তার দুরন্তপনার গল্প কতদূর সত্য কতদূর 'মিথ' বলা যায় না। অলোকসামান্যতা প্রমাণ করার জন্য কিছু 'কল্পনা' মেনে নিলেও শ্রদ্ধেয় ড. সুশীল কুমার দের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, শ্রীচৈতন্য কিছু ব্যাকরণ জানতেন—ঐ পর্যন্ত। অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব বৈষ্ণব গোস্বামীদের সংযোজন। চৈতন্য বেদান্ত জানতেন, না সার্বভৌমের কাছে শিখলেন, তা নিয়েও সংশয় আছে। এখানে দুটি প্রসঙ্গের স্পষ্ট জবাব চাই। এক. সার্বভৌম কেন চৈতন্যকে স্বীকৃতি দিলেন? তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠার কাছে তরুণ নিমাই একান্ত তুচ্ছ, তখন প্রতাপরুদ্রও তাঁকে চেনেন না; সুতরাং ইচ্ছে করলেই বাসুদেব সার্বভৌম উড়িষ্যা থেকেই তাঁকে বিতাড়িত করতে পারতেন।

দুই· রাজগুরু রামানন্দ রায় চৈতন্য-সাক্ষাৎকার ও সংলাপে মুগ্ধ হলেন কোন্ গুণে? তখনও তো তিনি ষোলআনা ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন নি। বিদ্যা দিয়েই বিদ্বানকে জয় করতে হয়েছে। তারপর পোথায় ডুরি। নইলে মানুষ শুনবে কেন?

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। খুব কঠিন শিক্ষা। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় ঘটানো। চৈতন্য তা পেরেছেন। তাই মনে মনে গৃহী বিশ্বম্ভর দুবার বিয়ে করেও সন্ন্যাসী হয়েছেন—সন্ন্যাসের টানে নয়। সন্ন্যাসীর কাছে ছাড়া কেউ ধর্মকথা শুনতে চায় না বলে। 'মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া' উক্তির তাৎপর্য এই আলোয় বুঝতে হবে। সন্ন্যাসী দিয়ে তো সমাজ গড়ে ওঠে না। তিনি সামাজিক গৃহস্থদের মধ্যেই শ্রেয়সের জীবনচর্চা প্রচার করেছিলেন। তাই তাঁর প্রভাবে সন্ন্যাসী অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ বেশি বয়সে সংসারী হন। তাঁর শেষ আঠারো বছরের নীলাচলপর্ব অবশ্য সাধারণ গৃহস্থ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বরূপ দামোদরের অনুজ্ঞা ও ছাড়পত্র না পেলে চৈতন্য-সাক্ষাৎকারের সুযোগ মিলত কিনা সন্দেহ। অবশ্য প্রতি বছর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়জন সমবেত হতেন নীলাচলে। তখন নিশ্চয় ভাব-বিনিময় হত। কিন্তু সেতো বৈষ্ণব মহান্ত, পণ্ডিত ভক্ত বা বিদগ্ধ রসিকজনের সঙ্গ-সান্নিধ্য। যে আপামর মানুষ 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ' আহ্বান শুনে কাছে এসেছিলেন, তাঁদের সামনে ধীরে ধীরে আড়াল রচনা করলেন মহান্ত বৈষ্ণবেরা। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, খেতুরি, গোয়ালপাড়া, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ, গোপীবল্লভপুর উড়িষ্যার অগণিত মানুষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যে মনুষ্যত্বের দ্বারা মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের আহ্বান শুনেছিলেন, সে পথে কখন অজ্ঞাতে বিধিনিষেধের কাঁটা পড়ল। যাঁরা নিষ্কিঞ্চন, তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন; যাঁরা গৃহী মহান্ত তাঁরা গদীয়ান হয়ে বসলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই তাঁর সৃষ্ট ভাব-আন্দোলনে স্খলন-পতন-ত্রুটি প্রবেশ করেছিল। যদি যবন হরিদাসের শব-কোলে শ্রীচৈতন্যের আত্মীয় বিয়োগের অনুভূতি বৈষ্ণব মহান্তদের কাছে শিক্ষণীয় আদর্শ তুলে ধরত, তাহলে বৈষ্ণব পাটগুলিতে আবার পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসত না। মহান্তদের পাটোয়ারি বৃত্তির কথায় পরে আসছি।

ঘ· তুর্কীবিজয়, ইসলামের অব্যবহিত ও দূরপ্রসারী প্রভাব

১২০৩ সালে তুর্কী বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনকে হারিয়ে বঙ্গ-বিহার জয় করলেন। উড়িষ্যা স্বাধীন শৈবরাজার অধীন ছিল। প্রথম বিজিত হিন্দু বাঙালী

যথার্থ বি-ভাষা, বি-ধর্মের সংঘাতে হতচকিত হল। তার আত্মসন্তুষ্টির ছোট বলয় ভেঙে চুরে গেল। তার আগেই মুসলিম দরবেশরা এদেশে আসতেন, সম্মানও পেতেন। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে ইসলামের অন্য চেহারা প্রত্যক্ষ করে বাঙালী ভীত সন্ত্রস্ত হল—অন্তত রাজপুরুষেরা। কারণ তাঁরাই বৃত্তি ও 'প্রিভিলেজ' থেকে বিচ্যুত হলেন। সাধারণ মানুষ যে রাজশক্তির পরিবর্তনকে পুরাণ-বিহিত বলেই মানিয়ে নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাই ধর্মমঙ্গলে।

ধর্ম হৈলা যবন রূপী   শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান,
চাপিয়া উত্তম হয়   দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ   বিষ্ণু হৈল পৈগম্বর।
মহেশ হইল বাবা আদম।
গণেশ হইল কাজী   কার্তিক হৈল গাজী
ফকির হৈল মুনিগণ।

কবির মনে কোন ক্ষোভ নেই। সেই তো সব ঠিক আছে। কেবল নামে ও ভঙ্গিতে হের-ফের। এইখানেই রক্ষণশীল হিন্দুর সঙ্গে রক্ষণশীল ইসলামের সহজ মেলবার জায়গা।

বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় কিছু অত্যুক্তি থাকলেও ইতিহাসের সত্যও লক্ষণীয়।

কতহুঁ তুরক বরকর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন-বড়ুআ,
মথাঁ চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া।

ইসলামের একটি ভালো দিক সকলের মজর কেড়েছিল।

কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে,
রামের ধনুক শর সবাকার হাথে।
সকল বচনে তারা সঙরে খোদায়,
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।

সেই আদ্যিকালের তীর-ধনুক হাতে পদাতিক সৈন্যের দল। কিন্তু দুটি জিনিস বিশেষ লক্ষণীয়: (১) এক ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস; (২) আচারগত সাম্য।

নমাজের সময় পাইক-বরকন্দাজ ও তুর্কী সেনাপতি এক তালাওয়ে হাত-পা ধুয়ে পাশাপাশি পশ্চিমমুখো হয়ে বসে। রোজার মাসে অনশনভঙ্গের মুহূর্তে ধনী-গরীবে পার্থক্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে ডোমের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই, নাতিরও নয়; কিন্তু ডোমের শুয়োর সেখানে ঢুকে পড়ায় কি দুর্দৈব! সেন-আমলের পাণ্ডিত্য, ইসলাম-পূর্বকালের মননচর্চার একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরে। জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, হলায়ুধ, উমাপতি, গোবর্ধন প্রমুখ খুবই বিদগ্ধ এবং প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কিরকম তাঁদের বৈদগ্ধ, তাঁদের মননচর্চার প্রবণতা ছিল কোন্ দিকে? জয়দেব সুকবি, কিন্তু শৃঙ্গার সম্ভোগের কবি—বিলাসব্যসনের কবি। প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেট স্মরণ করা যেতে পারে।

পাণির চাতুরী হল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥
আদিরসে দেশ ভাসে অজয়ে জোয়ার।
ডাক কল্কি ম্লেচ্ছ আসে করে করবাল,
ধূমকেতু-কেতুসম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার।

গোবর্ধনের 'গাথা সপ্তশতী'র মধ্যে সম্ভোগাখ্য প্রেমবর্ণনার পর্যুসিত পৌনঃপুনিকতাই বেশি; তবে এই বর্ণনায় কবির অবসাদ এবং বিরূপতারও ইঙ্গিত পাই। 'সেখশুভোদয়া'র উল্লেখ থেকেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। মাধবী-কুমারদত্ত-বল্লভার কাহিনীতে সামন্ত সমাজের কদর্য নারী-লোলুপতারই পরিচয় মেলে। গোবর্ধনের ভর্ৎসনায় অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রই প্রতিবিম্বিত—'ভবান্ যাদৃশো ধার্মিকস্তাবদবগতম্, শ্রীমতাং রাষ্ট্রমচিরান্নষ্টং ভবিষ্যতি।' ধোয়ী তাঁতী ছিলেন বলে তাঁকে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল বামুন-পণ্ডিতদের কাছে। তিনিই বোধহয় ছিলেন যথার্থ সরল সহজ সাদাসিধে জীবনযাপনে তৃপ্ত। আর বাকি সকলেই হিন্দু-আমলের তথাকথিত গৌরব যুগের ভোগ বিলাসে দিশেহারা।

হলায়ুধ মিশ্রের ভূমিকাটিও বিচার্য। তিনি তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল জাতীয় অযথা চুলচেরা তর্কে যথেষ্ট বুদ্ধির কসরৎ দেখিয়েছেন। তাঁর 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' আসলে বিবিধ নিয়মের আনুষ্ঠানিক বেড়াজাল। তার মধ্যে শাস্ত্র বা দর্শন সামান্য, আছে ছদ্মশাস্ত্রের বেশে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ও বুজরুকির বিপুল আয়োজন।

সব মিলিয়ে সেন-আমলের উজ্জ্বলতার নীচে অনেকখানিই গাঢ় অন্ধকার জমে ছিল। তাই বখতিয়ার খিল্‌জী-র আক্রমণে সাধারণ মানুষ হয়ত ভেবেছিল, অবস্থা আর কত খারাপ হবে, আমাদের পক্ষে সব রাজাই সমান। সেজন্য তারা এই পরিবর্তনকে বেশি গুরুত্ব দেয়নি।

ইসলাম বিজয়ের অব্যবহিত ফল হলো থমকে দাঁড়ানো, নতুন শাসকবর্গের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা। শিক্ষিত সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ধর্ম বা নিরাপত্তার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না ; 'বৃত্তি' থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে দেশ ছাড়লেন। তাই তেরো ও চোদ্দর শতকে লেখা কোন বইপত্রের খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দুশো বছরকে 'অন্ধকার কাল' বলব কোন্‌ যুক্তিতে। জনসাধারণ তো দেশ ছেড়ে পালায়নি ; পাঠান আমলে কৃষকের দেয় করও খুব পীড়নমূলক ছিল না। তাছাড়া বাউল-দরবেশ-সহজিয়াদের মানবপন্থী সাধনায় নীচের তলার মানুষ মিলেছিল। বাগ্দী, ডোম, কাহার, জেলে-কৈবর্ত প্রমুখ মাটির সন্তানদের পূজ্য বনচণ্ডী, সাপের কামড় ঠেকানোর দেবী, ওলাওঠা-কুষ্ঠ ঠেকানোর দেবদেবী—এই সময়েই ওপরতলার তথাকথিত আর্যীয় থাকের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। এর থেকে বড় পাওনা আমরা যা পেয়েছি, তা হল ইসলাম বিজয়ের দূরপ্রসারী ফল।

আগেই বলেছি, চৈতন্য-আন্দোলনকে ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত, ইসলাম-প্রভাব গৌণ ব্যাপার—অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। যখন বাংলা-বিহারে সুলতানী শাসন, তখন উত্তর ভারতে মোগল শাসন শুরু হয়ে গেছে। পাঠান-মোগল আমলের পার্থক্য যতই থাক, একটি ব্যাপারে ইসলাম সমগ্র ভারতে গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে। সেটি হল হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ বিষয়ে সংশয়। ইসলামের আচারসাম্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্ণবৈষম্যে পীড়িত নীচু-থাকের বর্ণ-জাতির মানুষ দলে দলে ইসলামকে গ্রহণ করেছেন। আবার একথাও ঠিক, অগ্নিকাণ্ডের সময় অপছন্দ পড়শীর সঙ্গেও মিলিতভাবে আগুন ঠেকাতে হয়। কারণ বিপদটা উভয়ের। সেজন্যই ওপরতলার হিন্দুরা দায়ে-পড়ে কিছু উদারতা দেখালেন। শ্রীচৈতন্য সেই সামাজিক ঘটনাকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিলেন। 'বরণ আশ্রম / কিঞ্চন-অকিঞ্চন' সকলে সমান। যবন হরিদাস, জগাই-মাধাই, সদ্গোপ শ্যামানন্দ, সদবিপ্র রূপসনাতন, রঘুনাথ ভূগর্ভ লোকনাথ আদি তাঁর কাছে অভেদ। 'সর্বোত্তম নরবপু'—এর মধ্যে জাতিভেদ নেই। এখনকার দিনে এ আন্দোলন এমন কিছু নয়। কিন্তু সাক্ষরতার হার যেখানে শতকরা আশির বেশি, সেখানেও ছুৎমার্গ, হরিজন পুড়িয়ে মারা এখনও নিত্যকার সংবাদ। কিন্তু বাংলায় তো

এরকম নিষ্ঠুরতা ঘটে না। কারণ শ্রীচৈতন্য তার জড় মেরে দিয়েছিলেন। এখনও আমরা সেই আন্দোলনের সুফল ভোগ করছি।

অদ্বৈতবাদী মুসলমান সূফীরা বৈষ্ণবের মতোই দ্বৈতবাদকে মানে। 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন' মুসলমান কবিদের আসলে 'চৈতন্য প্রভাবাপন্ন' বলাই সমীচীন। 'জন্ম নিয়া মুসলমানে / বঞ্চিত হব কি কারণে'—পঙ্‌ক্তির মধ্যে যে আর্তি, তাতে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নেই, আছে শ্রীচৈতন্যের যুগোচিত মানবসমাজ-সংস্কারের স্বীকৃতি। বাউলদের অনেক গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যকেই আদি বাউল মনে করেন। কারণ সহজিয়া বাউলরা জাতি-পাতের বিভেদ মানেন না, এবং শ্রীচৈতন্য তাঁদের অনেকের কাছে প্রেরণা-উৎস। শরৎ বাউল বলেছেন,

আইলোরে চৈতন্যের গাড়ী সোনার নদীয়ায়।
(আজি) রাই-কোম্পানির জংশন হৈল শ্রীবাস আঙ্গিনায়॥
জগাই মাধাই হয় প্যাসেঞ্জার
নিত্যানন্দ টিকিট-মাস্টার,
আইজ শ্রীগৌরাঙ্গ ড্রাইভার হইয়্যা
সেই গাড়ি চালায়।
আজি গরীব লোকের কি সুবিধা
ধনী বইল্যা নাই তো বাধা
আজি ভক্তিবিধান দান করিলে
টিকিট পাওয়া যায়
ও দীন শরৎ বলে, যাবো কাছে,
রাধারাণীর চালা আছে,
তারা ফাস্ট কেলাসের টিকিট কেটে
ব্রজধামে যায়।

সতের শতকের সত্যপীর-ধর্ম যেমন নীচের তলার মানুষের মিলন-আকাঙ্ক্ষার ফল, এর মধ্যে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে অনেক বড়ো সমাজসত্য, ষোড়শ শতকে তেমনি চৈতন্যধর্মই হল বাঙালীর মানব-সংস্কৃতি।

শ্রীচৈতন্য বোধহয় বজ্রসূচীকেই ভক্তির আলোয় ব্যাখ্যা করেছিলেন :

নীচজাতি হৈলে নহে ভজন অযোগ্য।
সৎকুলে বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যে ভজে সেই শ্রেষ্ঠ অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভক্তজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

রামমোহন 'বজ্রসূচী' থেকেই উদ্ধৃত করেছিলেন, 'যেহেতু শাস্ত্রে কহে জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ শব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন, অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে—ইহা নিশ্চয় হইল।' রামমোহনের জোর ব্রহ্মজ্ঞানে, শ্রীচৈতন্যেরও জোর ব্রহ্মজ্ঞানে, তবে সেটি মানবব্রহ্ম এবং ভক্তিমার্গে লভ্য।

যে-মঙ্গলকাব্য মূলত বৈষ্ণবধারার বিরোধী, তার মধ্যেও চৈতন্যপ্রশস্তি স্থান পেয়েছে। এই স্বীকৃতি সম্প্রদায়গত ধর্মের উর্ধ্বে। মুকুন্দ-মাধব শুধু নয়, অন্য কবিও দেবখণ্ডে তাঁকে স্থান দিয়েছেন। খুল্লনার কান্নাকাটি সত্ত্বেও ধনপতিকে ফিরিয়ে আনতে শ্রীমন্ত যাচ্ছে জলযাত্রায়, মঙ্গলকবির মনে পড়ল শচীকে ছেড়ে বিশ্বম্ভরের ঘর-ছাড়ার কথা। তাই মাধব বিষ্ণুপদ লিখেছেন, 'রহাঅ নদীয়ার লোক, বৈরাগে চলল দ্বিজমণি।'

একটি ইতিহাস প্রবাহের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য আন্দোলনকে যুক্ত করে দেখলেই পাঠান-মোগল আমলের একটি বিশেষ প্রবণতা বা মানসিক প্রতিক্রিয়া চোখে পড়বে। রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, দাদূ, রজ্জব—সকলেই সমন্বয়পন্থী। আউল-বাউল দেহবাদীরাও মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী।

রামানন্দ ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণত্বের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সংস্কৃতবিদ্, তবু চলিত ভাষায় 'লোক নিস্তারিতে' উপদেশ দিলেন। তাঁর প্রধান বারো শিষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ কই? রবিদাস মুচি, কবীর জোলা, সেনা হলেও নাপিত, ধন্না জাঠ আর পীপা রাজপুত। নামদেব ছিলেন দরজি। বজ্রসূচীর 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞাকে কবীর যেন ব্যাখ্যা করেছেন,

জো তূ করতা বরণ-বিচারা।
জন্মত তীনি ডংড অনুসারা।
জন্মত সূদ্র মুয়ে পুণি সূদ্রা।
ক্রিতিম জনেউ থালি জগ ধুংদ্রা॥
জো তুম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি জায়ে।
আবর রাহতে কাহে ন আয়ে॥

এই সহজ সন্ত-মতের সঙ্গে ষোড়শ শতকের চৈতন্য-ধর্মের মিল ঘটে গেল। আধুনিক

sub-altern পন্থীদের মতে একে নিম্নবর্গের জাগরণ বলা যেতে পারে। সন্তমতের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষ মানবধর্ম প্রসঙ্গে মোগল সম্রাট আকবরের কথা বলতে হয়। তাঁর ইবাদৎখানায় নানা মতের সাধক সন্তদের যে আলোচনা সভা বসত, তার মধ্যেও বৈষ্ণব ভক্ত কেউ থাকতে পারেন। তাঁর প্রবর্তিত দীন-ইলাহীর মধ্যে এমন সব সামাজিক বিধিনিষেধ যুক্ত হয়েছে, যাতে বৈষ্ণব প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী দীন-ইলাহী গ্রন্থে দেখিয়েছেন (Section III—The Hindus at the Court of Akbar) আকবরের দরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মধু সরস্বতী, মধুসূদন, নারায়ণ মিশ্র, দামোদর ভাট, রামতীর্থ, নরসিং, পরমিন্দ্র, আদিত্য, রামভদ্র, শ্রীভট্ট, রামকৃষ্ণ, বলভদ্র মিশ্র, বাসুদেব মিশ্র, ভগীরথ ভট্টাচার্য, কাশীনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁর অনুরোধেই ফৈজি অনুবাদ করেন যোগবাশিষ্ট, লীলাবতী, নল-দময়ন্তী, বত্রিশ সিংহাসন, হাজী ইব্রাহিম অথর্ববেদ, মোল্লা শেরী হরিবংশ; রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ এক অনুবাদক গোষ্ঠীর যৌথ প্রয়াসের ফল, তার মধ্যে স্বয়ং সম্রাটও আছেন। দেবী নামে এক প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সম্রাটকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ ও মহামায়ার পূজা করতে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীচৈতন্য-তিরোধানের অব্যবহিত পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্মচর্চার খ্যাতি সম্রাটের কানে হয়ত পৌঁচেছিল। মানসিংহের মাধ্যমেও সে-সংবাদ আসা সম্ভব। কবিকংকন মুকুন্দ আক্ষেপ করেছেন—

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধীপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরীপ।

বদাউনী ও ফৌজী দুজনেই সংস্কৃত জানতেন। আমাদের অনুমান, দীন-ইলাহীতে অনুশাসন সবই জৈন প্রভাবজাত নয়। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা, নিরামিষ ভোজনের প্রবণতা, কোরাণ পাঠের আবশ্যিকতা বর্জন, আরবী-ফারসীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার প্রতিষ্ঠা, গৈরিক পট্টবাসের মহিমা ইত্যাদি বিধি প্রবর্তনের উৎসাহ বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে হওয়া বিচিত্র নয়। বৈষ্ণব ধর্মে ইসলাম-প্রভাব যেমন সত্য, তেমনি নবোদ্যমে দীন-ইলাহী ধর্ম প্রচারে জাহাঙ্গীরের উৎসাহ হয়ত অনেকাংশে বৈষ্ণব প্রভাবেরই ফল। জাহাঙ্গীরনামা গ্রন্থ থেকেও এই ধারণার সমর্থন মেলে।

৬. গোস্বামীদের ভূমিকা : শাস্ত্রের বদলে শাস্ত্র

চৈতন্যের আন্দোলন হঠাৎ অন্য পথে গেল ; নিজের জমি ত্যাগ করল। বাংলায় রয়ে গেলেন শ্রীবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, নরহরি, মুরারি, মুকুন্দ প্রমুখ। বিদ্বান ও বিদগ্ধ রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ প্রথম গেলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের মাটির সঙ্গে এইসব বাঙালী অধিবাসিত বৈষ্ণবদের কোন আত্মিক সম্বন্ধ ঘটেনি। বলা যায়, তাঁরা নিজেরা একটি বিদ্যাচর্চা, সাধন-ভজন এবং শাস্ত্র-অনুশীলনের কেন্দ্র খুলেছিলেন। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রের বাঁধন ছিঁড়ে আচণ্ডালে একই মনুষ্যত্ব দেখেছিলেন—সেজন্যই মানুষ জেগেছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণব হবার আগে পণ্ডিত ছিলেন, পরেও পাণ্ডিত্য-কর্ম যায় নি ; শুধু রূপ বদলেছিল। তাঁরা আবার নানা বিধিনিষেধ, আনুষ্ঠানিকতা, কৃত্যাকৃত্যের জালে সমাজকে বাঁধতে চাইলেন। বৈষ্ণবাপরাধের তালিকা এবং অপরাধ মুক্তির উপায় বর্ণিত হল। সনাতন শিক্ষা, রামানন্দ-চৈতন্য আলাপ (সাধ্যসাধনতত্ত্ব) ইত্যাদি বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবনাচরণকে একটা মার্জিত বিদগ্ধ Elitist মর্যাদা দিয়েছে। সেই পরিমাণে জনগণের জীবন থেকে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, সঙ্গীত পারিজাত, রূপাবলী, পদ্যাবলী, দানকেলি কৌমুদী, উজ্জ্বল নীলমণি, উদ্ধবসন্দেশ, ষট্-সন্দর্ভ যাঁরা চর্চা করতেন, তাঁরা সকলেই নমস্য বুদ্ধিজীবী। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে যে বিপুল জনজাগরণ হয়েছিল, সেই স্রোতের সঙ্গে এই বৈদগ্ধ্যের ধারার কোন মিল ছিল না। তারা নামকীর্তন মালাজপ আর গৌরবন্দনা নিয়েই তৃপ্ত থাকত। আসলে তারা গরীব, নিষ্কিঞ্চনতার দর্শন তাদের মুক্তি দিয়েছিল হীনমন্যতা থেকে। কিন্তু কোন 'Filtration'-পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা বৈষ্ণবের ওপর তলার জ্ঞান নীচের তলায় চুঁইয়ে পড়তে পারে। কেবল ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে কথকতা-সূত্রে বৈষ্ণব তত্ত্বাদির কিছু সরলীকরণ সাধারণের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। কিন্তু দুটি ধারা পাশাপাশি বয়ে গেছে। একটি পণ্ডিত বিদগ্ধজনের আচরিত ; অন্যটি ব্রাহ্মণ-শাসিত স্মৃতিনির্ভর হিন্দুসমাজের পীড়িত মানুষজনের জাগ্রত চেতনার ধারা। নিত্যানন্দ যৌথভাবে বহু মানুষকে একসঙ্গে বৈষ্ণব সমাজে আনলেন। অতটা দরজা খুলে দিলে কোন নীতির আগল থাকবে না, এইরকম আশংকা ছিল অদ্বৈতের মনে। গদাধর কোনমতে চৈতন্য-অনুসারী একটি শিষ্যসমাজ নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। নরহরি সরকার দাপটের সঙ্গেই বোধহয় জমিদারি, তেজারতি এবং শিষ্য-সম্প্রদায় চালিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আর যে পার্থক্যই থাক, মিল ছিল এক জায়গায় ; এঁরা কেউই চৈতন্য-আন্দোলনের

মাটি ছাড়েননি। তাই সকলেই বাংলায় উপদেশ দিয়েছেন, বাংলায় সাহিত্য রচনা করেছেন। প্রথম নারীশিক্ষা এঁদের দ্বারাই বৈষ্ণবসমাজে চালু হয়। শিশু নরোত্তম জ্যেষ্ঠদের কাছে শুনে শুনেই অল্প বয়সে কৃষ্ণভাবনা ও চৈতন্যতত্ত্বের সার বুঝেছিলেন।

স্বরূপ দামোদর আদি যে-পক্ষ নীলাচলে কাটালেন, তাঁরাও যতটা আত্মমগ্ন এবং বিধি-নির্দিষ্ট পথের পথিক, ততটা আচণ্ডালে উৎসাহী নন। তাঁরাও একধরনের বুদ্ধিজীবী, তাঁদের 'দীনতার অভিমান' আভিজাত্যেরই নামান্তর। স্বরূপ দামোদরের ছাড়পত্র না পেলে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পাওয়াই সম্ভব ছিল না। আষ্টেপৃষ্ঠে সামাজিক বাঁধনের গ্রন্থিগুলি আল্‌গা করেছিল চৈতন্যধর্ম, এঁরা নতুন করে বাঁধন তৈরি করলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আদান-প্রদানের কোন মাধ্যম গড়ে উঠল না।

চ. উপসংহার

শিক্ষিত-অশিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজের এই সমান্তরালতা প্রথম পর্যায়ের মহান্তরা হয়ত বুঝতে পারেননি! পরবর্তী মহান্তরা বংশানুক্রমে দীক্ষাদান, দান ও শিষ্যসেবাগ্রহণের ব্যবসা চালিয়েছেন। এমন বৈষ্ণব মহান্ত পরিবার মেলা কঠিন যাঁরা শিষ্য-যজমান ঘর চালিয়েই যথেষ্ট ভূসম্পত্তি করেননি। সব যাঁরা একদিন ছাড়তে শিখিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরদের কাছে এটি জীবিকা উপার্জনের একটি সহজ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। মনে হয়, শ্রীখণ্ডের বৈদ্যরা (নরহরি সরকার-শাখা) এখনও পূজার্চনার কাজ নিজেরাই করেন; অন্যসব পাট-বাড়িতেই ব্রাহ্মণ পূজারী। শ্যামানন্দ (সদ্গোপ) পাটের জৌলুষ সবচেয়ে কম।

সতেরর শতক থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের জঙ্গমতা হ্রাস পাচ্ছিল। চৈতন্য-আন্দোলনের উজ্জীবনী প্রভাব তখন গতানুগতিকতা ও আনুষ্ঠানিকতায় স্তিমিত। যে কোন ধর্ম আন্দোলনের প্রাণশক্তি একসময় তার উজ্জ্বলতা হারায়। যেহেতু সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো আমূল না বদলালে ধর্ম বা সংস্কৃতির মৌল পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব, তাই এই পরিণতিও অবশ্যম্ভাবী। যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাও নষ্ট হল: (ক) ঐতিহাসিক কারণে, (খ) বৈষ্ণবদের পাটোয়ারী বুদ্ধি ও আদর্শহীন আনুষ্ঠানিকতায়, (গ) নতুনভাবে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও স্মৃতি-অনুশাসনের প্রতিষ্ঠায়, এবং (ঘ) তান্ত্রিক ও সহজিয়া সংস্রবে।

চৈতন্য উত্তরাধিকার ও একটি-লোক ধর্ম

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

সাধারণ ভাবে সমগ্র বাংলাদেশে জৈন-বৌদ্ধ ও বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত এতদিন পোষণ করে এলেও সাম্প্রতিক ইতিহাস মোটামুটি ভাবে স্বীকার করে যে গুপ্তযুগের পূর্বে বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার বিষয়ে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন। অতএব প্রাক্-গুপ্তযুগে অবৈদিক ব্রাত ধর্ম এবং অন্-আর্য জীবনাচরণ এই দুই ছিলো এদেশের আদি সংস্কৃতি। এবং এর পরের অবস্থা এই যে: 'প্রাক্-গুপ্ত পর্বে বাংলার জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অল্পবিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য-বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাংলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নাই, ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?) তাহাও নিন্দাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাংলাদেশ আর্য-বৈদিক সংস্কৃতির বহির্ভূত'।[১]

পরবর্তীকালে গুপ্ত-শাসনের স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে সুবে বাংলার ধর্ম-কর্ম ধ্যান-ধারণায়, দুই দফার পাল রাজত্বে (আনুমানিক ৭৫০—১১৬১ খ্রীষ্টাব্দ) এলো বৌদ্ধ ধর্মের সুসময়। তারপরে বর্ম এবং সেন রাজবংশের শাসনকালে সমগ্র বাংলায় আবার ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হয়। এর সঙ্গে আদি লোক-ধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব তো রয়েইছে। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসেছে মুসলমান শাসনাধিকার। এই নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে আগত সম্পূর্ণ নতুন ধর্মমতের সংঘাত বা বোঝাপড়ায় বাংলার পরবর্তী বছরগুলি নানাভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র দেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ক্রমান্বয় সংখ্যাবৃদ্ধি এবং কেবল আজ নয়, সেই সুঅতীত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক নিপীড়ন, অবজ্ঞা,

মানবিক লাঞ্ছনায় পিষ্ট নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে এই নবাগত ইসলাম ধর্ম নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী, আচার-সর্বস্বতা, আত্মপরতন্ত্রতার চূড়ান্ত—সমগ্র জনগোষ্ঠীর সামনেই কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি তুলে ধরতে বা আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নি। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতির ধর্ম ও আচার প্রবল শক্তি, মুসলমান ধর্মও শাসকের সামনে ক্রমশই হীন-বল হয়ে পড়েছে। সমস্ত মুসলমান শাসককেই পর ধর্মমত সম্পর্কে উদার ও প্রজাপালক ভাববার কোন কারণ নেই।[২] বরং সুযোগ পেলেই হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখার ওপর তাঁদের অনেকেই আক্রমণ করেছেন, মন্দিরাদি ধ্বংস করেছেন। অন্যদিকে নিজের দুর্বলতায় ও ভেদ বুদ্ধিতে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মমতগুলি ক্ষতবিক্ষত। বীরাচারী, পশ্বাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিক উন্মত্ততায় সমগ্র বাংলাদেশের সমাজ-মানস মুসলমান আক্রমণের তিনশত বছরের মধ্যেই খণ্ড বিচ্ছিন্ন এবং ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

ঠিক এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নবদ্বীপচন্দ্র, জগন্নাথ-শচীমাতার নয়নের নিধি নিমাই (জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁর জীবনমুখী বাস্তববুদ্ধি দিয়ে সমাজের আসল চেহারাটা দেখতে পান। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ও অত্যাচারের ফলে ধর্মের নীচের ভিতটা কিভাবে যে ধ্বসে পড়েছিলো তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি খুব সরলভাবে এবং সহজ ভাষায় হিন্দুধর্মের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে বৈষ্ণব ধর্মের সাধন-ক্রিয়াকে উপস্থিত করলেন। অগণিত দরিদ্র মানুষের অপমানিত ও নির্যাতিত মনুষ্যত্বকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সকলকেই নিজের ভাই, আত্মার আত্মীয় বলে আহ্বান করলেন। কেবল একবার 'কৃষ্ণনাম কর', 'মুখে শুধু একবার হরিবোল বল'—তাহলেই তোমার সব পাপের ক্ষয়, তোমার আত্মার মুক্তি: ধর্মাচরণের এই সাধারণীকরণের সরল পদ্ধতিতে আপামর জনসাধারণ বিশেষভাবে অভিভূত হলো, অন্ত্যজ শ্রেণী, সমাজের নিচুতলার মানুষেরা তাঁদের মানবীয় মূল্য-বোধকে সম্মানিত হতে দেখে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানেরাও এই আহ্বান থেকে দূরে থাকতে পারলেন না।

এইভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেমভক্তিময় ধর্মভাবে নতুন করে জেগে উঠলো। বাঙালীর চিন্তা-ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই মনুষ্যবোধের উদ্বোধন এক যুগান্তকারী তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এলো। এই প্রেমভাব, এই মানবিকবাদ কেবল নদে-শান্তিপুর বঙ্গদেশকেই নয়, প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতকে পরিপ্লাবিত করে দিল। কিন্তু বহুদিন এমনভাবে গেল না। কারণ চৈতন্যদেবের নাম-মুখ্য সহজ-আচরণীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রাথমিক

জোয়ার স্বাভাবিক কারণেই ধীরে ধীরে নানা আচার, সাধনা ও রীতিনীতির বন্ধনে বাঁধা পড়লো। সাধের কৃষ্ণনাম উচ্চারণ, সাধ্যের বৈষ্ণব ধর্মাচরণের দ্বারা রীতি-নির্দিষ্ট (codified) হলো। অপরপক্ষে চৈতন্য-প্রবর্তিত সাম্যবোধকে ধীরে ধীরে অবদমিত করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাঁদের ভেদবুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। শাক্তরাও তান্ত্রিক আচার-সর্বস্বতার উগ্রতাকে সত্ত্ব-গত বৈষ্ণবীয় পেলবতার দ্বারা পরিশোধিত করে নিয়ে বহু নতুন ক্ষেত্রেই নতুন নতুন রূপে প্রকাশ করতে লাগলেন, যার প্রত্যক্ষ ফল সাধক কবি রামপ্রসাদ। অন্যদিকে, বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও যথার্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ধর্মনেতার অভাবে আস্তে আস্তে শিথিলতা, অনাচার, চ্যুতি দেখা যেতে লাগলো।

এই সব মিলিয়ে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় এসে দাঁড়ায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শাক্ত এবং তৎ-অনুগামী ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি। কারণ চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত প্রভাব ও তাঁর সরল এবং আন্তরিক মানব-প্রেমধর্মের প্রভাবে জেগে-ওঠা সমস্ত স্তরের মানুষের দ্বারা আপাত-পরিত্যক্ত উক্ত প্রবল শক্তিধর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি কিছুকাল নির্জীব হয়ে থাকার পর, যেই বৈষ্ণব ধর্মের দুর্বলতার সুযোগ পেল, অমনি বিপুল বেগে আত্ম-প্রকাশ করলো; ভেদবুদ্ধি ও তজ্জাত অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এর ফল কি হলো? ফল হলো এই যে, চৈতন্যদেবের নাম ও প্রেম ধর্মের দ্বারা মানবতা ও মনুষ্যত্বের যে উদ্বোধন নিচুতলার মানুষগুলোর মধ্যে ঘটেছিল, যাঁরা নিজেদের মানুষ বলে চিনতে শিখেছিলেন, তাঁরাই ঐ চৈতন্য-মানব-প্রেমের প্রভাবে প্রাপ্ত মানবপ্রেমের শক্তিতে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের শরীয়তি শাসনের কট্টরতার মধ্যে আর ফিরে যেতে চাইলেন না, তেমনি অন্যপক্ষে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য শাসনের সেবাদাসত্ব গ্রহণেও আর রাজী হলেন না। তাঁরা চৈতন্য ধর্মের সহজ ভাব, ভাষা ও আন্তরিকতাকে,—যা দিয়ে নিজেদের প্রাণের ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছিলেন,—নিজের সমাজের মতো করে, নিজেদের বুদ্ধিমতো ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন নতুন ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। অর্থাৎ সমালোচকের দৃষ্টিতে ঘটনাটি এই রকম: "শ্রীচৈতন্যের প্রাণবান্ সত্য ধর্ম মানুষের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে মনকে আর একেবারে ঘুম পাড়ানো গেল না। ভক্তি-রসের প্রশস্ত নদীর মুখে বাঁধ পড়ল, জল ছাড়া হতে লাগল কাটা খালে। কিন্তু এই বাহ্ সহজ রসধারা অবিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজ বহির্ভূত অনাচার লাঞ্ছিত সুদরিদ্র সাধক গোষ্ঠীর চিত্তক্ষেত্রকে সরস উর্বর করে দিয়ে। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই নামাঙ্কিত এই 'সহজ' সাধকগোষ্ঠীই চৈতন্য সাধনার স্বাভাবিক অধর-সাধক"।[৩]

এই অধরসাধকদের অন্যতম হচ্ছেন আউলচন্দ্র বা সত্যমহা মহাপ্রভু আউলেচাঁদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) যখন পলাশীর যুদ্ধ ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পট-পরিবর্তনের আভাষ দেখা দিচ্ছে তখন উক্ত আউলচন্দ্র হারিয়ে যাওয়া উদার ভক্তি সাধনাকে (অবনমিত হয়ে যাওয়া মানবিকতা-বোধকে), গোষ্ঠীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে, ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে সমস্ত স্তরের, বৃত্তির, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও জাতির মানুষের সমান অধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কে এই আউলচন্দ্র ? কি তাঁর পরিচয় ? প্রকৃত ইতিহাস এ-বিষয়ে নীরব। জনশ্রুতি মাত্র সম্বল। তবুও আমরা আউলচন্দ্র সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য ও জনশ্রুতি নিষ্কাষণ করে কিছু তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করবো। এই মতাদর্শে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী জনৈক দেবেন্দ্রনাথ দে মহাশয় আউলচন্দ্র সম্বন্ধে লিখছেন : 'আউলচাঁদ নামক জনৈক সাধকই এই ধর্মের প্রবর্তক। প্রায় সর্বত্রই ইঁহাকে ফকির বা ফকির ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।…আউলচাঁদ নিজে মুসলমান ছিলেন অথবা হিন্দু হইয়া কোন মুসলমান ফকিরের শিষ্য ছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে প্রবর্তনের কাল হইতে এই ধর্মমতের সহিত ইসলামের কিছু কিছু সংযোগ ছিল… ।

'আউলচাঁদ সম্পর্কে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একটি বেশ দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক। জন্মের পর প্রথম ৭।৮ বৎসর বাদে প্রায় সমস্ত জীবনের কাহিনীই ইহাতে পাওয়া যায়।….তবে ..এই কাহিনী ঐতিহাসিক ভাবে নির্ভুল কিনা তাহা বলা সম্ভব নয়।…যাহা হউক কাহিনীটি নিম্নরূপ :

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাবীরনগর গ্রামে মহাদেব দাস নামক জনৈক বারুই বাস করিতেন।….তাঁহার একটি পানের বরজ ছিল। ১১০১ বঙ্গাব্দে (বা ১৬১৬ শকাব্দ বা ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) দোল পূর্ণিমার দিনে অতি প্রত্যুষে মহাদেব যথারীতি বরজে গিয়াছেন। অর্গলবদ্ধ বরজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। বরজের মধ্যে আনুমানিক অষ্টম বর্ষীয়, সৌমমূর্তি, ললাটে গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় দিব্য-ভাতি, ছিন্ন কন্থা পরিহিত একটি বালক। বালকটি কথা বলিতে পারে, কিন্তু নিজের আত্মপরিচয় দিতে পারে না।…নিঃসন্তান মহাদেব ..তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসেন, এবং মহাদেবের স্ত্রীও তাহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতে থাকেন। বালকটির নাম রাখিলেন পূর্ণচন্দ্র।"

'পূর্ণচন্দ্র মহাদেবের বাড়ীতে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামবাসী হরিহর ঠাকুর নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সংস্কৃত ভাষা ও কিছু

ধর্ম-পুস্তক অধ্যয়ন করেন।···বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তে পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়া গ্রামে গিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাসের নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েই তাঁহার নাম হয় আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ। এরপর তিনি বজরা গ্রামে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন।' এই সময় আউলচাঁদ-এর বয়স বোধ হয় সাতাশ। এইখানে তিনি হটু ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনকে তাঁর সঙ্গী পেলেন এবং কিছুকাল পরে রামশরণ পাল তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করলেন। যতদূর জানা যায় যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) রামশরণ সুখসাগরের হাটে চাল কিনতে গিয়ে আউলচাঁদের দর্শন পান। এই দর্শনেরই পরিণতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ।

'আউলচাঁদের প্রধান শিষ্য ছিল বাইশজন। তাঁদের নাম—আন্দিরাম (আনন্দরাম), মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস, নয়ান দাস, লক্ষীকান্ত, প্যালারাম, (বা কেনারাম), কৃষ্ণদাস, কিনু গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু গোবিন্দ ও রমানাথ), শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায় রাজপুত, পাঁচকড়ি (বা পাঁচু রুইদাস), শিশুরাম, বিষ্ণু দাস, শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল ও নিধিরাম ঘোষ। আউলচাঁদের মৃত্যু সম্ভবত ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বা তার কিছু পরে।[৪] মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধ্যে দু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধি ব্যবস্থা নিয়ে। শেষে দু-জায়গায় দুরকম সমাধি দিয়ে মীমাংসা হল। আউলচাঁদের কাঁথার সমাধি হল বোয়ালে গ্রামে, তাঁর দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রামে'।[৫]

নানা জনশ্রুতি ভেদ করে ওপরে যে আউল-জীবনী বর্ণিত হলো তার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা শতকরা কতখানি নির্ভেজাল তা হলপ করে বলা কঠিন। তবে প্রায় সকল ধর্মসাধক সম্পর্কেই যে নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁর ভক্ত-সম্প্রদায় রচনা করে, উক্ত সাধককে মহাশক্তিধর দেবতার অংশ বা অবতার প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন, আউলচন্দ্র বিষয়েও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এ বিষয়ে 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের বেদ 'ভাবের গীত'-এ উদ্ধৃত একটি পদ আউলচাঁদের অলৌকিকতা সম্পর্কে বলছে :

'এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো,
এর নাইক রোষ সদাই তোষ
মুখে বল সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশজন সবার একটি মন,
জয় কর্তা বলে বাহু তুলে কল্লে প্রেমে চলঢল,
এর ছেঁড়া কন্থা গায়ে উনবিংশ চিহ্ন পায়

এ হারা দেওয়ায় মরা জীয়ায়

এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।'[৬]

এই ধর্মসাধক ও ভক্তগণের সবচেয়ে বড় বিশ্বাস এই যে, আউলচন্দ্র গৌরাঙ্গদেবের অবতার। 'গৌরাঙ্গদেব রাধা এবং কৃষ্ণের যুগলরূপের অবতার আর আউলচাঁদ গৌরাঙ্গদেবের অবতার, সুতরাং সেই হিসাবে অনু-অবতার।'[৭]

এবম্বিধ অবতার কল্পনার মধ্যে আউলচন্দ্রে কেবল যে অলৌকিকতা আরোপ করার ভক্ত-জনোচিত প্রবৃত্তি কাজ করেছে তাই নয়, এর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক-বোধকে সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি এই ধর্মমতের একজনের ভাষায় এই রকম: "কিন্তু সাথে সাথে এই ধর্মমত প্রবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারা-বাহিকতার একটি ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় পাওয়া যায় অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফৎ চৈতন্যদেবকে একটি প্রহেলিকা পূর্ণ সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন:

'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।' ইত্যাদি

অন্যান্য বাউলদের মত কর্তভজা সম্প্রদায়ও এই প্রহেলিকাটির তাৎপর্য নিজেদের অনুকূলে গ্রহণ করিয়া এই ভাবে ব্যাখ্যা করে যে বর্তমানে দেশের মধ্যে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম আর চলিতেছে না। সুতরাং নতুন প্রেরণার প্রয়োজন। হাটে চাউল বিকায় না, ইহার অর্থ প্রেমধর্মের কদর নাই। আউল-বাউল ইত্যাদি সম্প্রদায় মনে করেন যে উক্ত প্রহেলিকাটির অর্থ চৈতন্যদেবকে নূতন ভাবে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান। এই প্রহেলিকাপূর্ণ সংবাদ অবগত হইয়া চৈতন্যদেব অপ্রকট হন (৯৩৯ সালে) এবং প্রায় দেড় শত বৎসর পর আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন (১১০১ সালে)

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।

মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

বৈষ্ণবভাবাপন্ন ফকির হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য যে সহজ ধর্ম প্রচার করিলেন তাহা ভুঁই-ফোঁড় ধর্ম নহে, তাহার একটি ধারাবাহিকতা আছে, এই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের সহিত আউলচাঁদকে যুক্ত করা হইয়াছে। সে যাহাই হোক আউলচাঁদের ধর্মমতের সহিত চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের যে যোগ ছিল একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। আউলচাঁদকে চৈতন্যদেবের অবতার বলায় সেই যোগটি পরিস্ফুট হইয়াছে।"[৮]

সেই যোগটি খুঁজে পাওয়ার ফলে আরও একটি সামাজিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা এই যে নিত্যানন্দ গোস্বামীর (১৪৭৮-১৫৪৫। বিবাহ ১৫১৮) একমাত্র পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র 'বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সম্মানিত হয়ে নানা সংস্কার ধর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্ম প্রচারণায় তাঁর খুব নিষ্ঠা ছিল। উদার ধর্মমতের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণব সমাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়েও তিনি পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অবধূত নিত্যানন্দ জাতি পাঁতির বড় একটা ভেদ মানতেন না।·· পুত্র বীরভদ্র সেই আদর্শে দীক্ষিত হয়ে হীন পতিতকে কোল দিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, খেতুরী উৎসবে সর্বজনসমক্ষে কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা এবং নেড়ানেড়ী, নামে অপখ্যাত কদাচারী সহজিয়াদের বৈষ্ণব সমাজে স্থান দান। এ দুটোই বৈষ্ণব সমাজের বৈপ্লবিক সংস্কার বলে গৃহীত হতে পারে।····বৌদ্ধ সহজিয়াগণ বিচিত্র আচার-আচরণ এবং দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্ম মতবাদ বাংলার সমাজে প্রচার করেছিলেন। কালক্রমে হিন্দুধর্মের চাপে পড়ে এঁরা অনেকেই আত্মগোপন করেন এবং সমাজের গহনে মুখ লুকিয়ে থাকেন। ক্রমে ক্রমে এঁদের গোপনীয় ধর্ম-সাধনায় বহু অনাচার প্রবেশ করে। ফলে এই সমস্ত মুণ্ডিত মস্তক স্ত্রী-পুরুষ সহজিয়াদের সমাজে 'নেড়ানেড়ী' বলে ঘৃণা করা হতো। দয়াল বীরভদ্র দেখলেন হীন পতিতকে উদ্ধার করবার জন্যই চৈতন্য-নিত্যানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল। সুতরাং সামাজিক দিক থেকে হেয় উক্ত সহজিয়া নেড়ানেড়ীদেরও বৈষ্ণব মণ্ডলে গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁরই কৃপায় সহস্রাধিক নেড়া ও ততোধিক নেড়ী (বার শত নেড়া ও তের শত নেড়ী) তাঁর প্রভাবিত বৈষ্ণবসঙ্ঘে স্থান পায়। সহজিয়া নেড়ানেড়ীরা বৈষ্ণব সমাজে স্থান পেলেও এঁরা নিজ নিজ গোপনীয় ও রহস্যময় ধর্মাচার ছাড়তে পারেননি। এঁরাই পরে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে একটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করেন—এঁদের নাম বৈষ্ণব সহজিয়া।···বীরভদ্র মানসিক ঔদার্য ও বৈপ্লবিক আদর্শের বশে এঁদের বৈষ্ণব সমাজে স্থান দিয়ে আশ্চর্য সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।'[৯]

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অনৈতিহাসিক হবে না যে : ক. আউলচাঁদ ও কর্তাভজা' বীরভদ্রের উদার ধর্মসংস্কারের অঙ্ক লালিত সন্তান। খ. এই ধর্মমতের আচার-আচরণ এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'নেড়ানেড়ী'র অপস্পষ্ট বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[১০] গ. বীরভদ্রের আশ্চর্য সামাজিক বুদ্ধি নিচু তলার নিষ্পিষ্ট হিন্দু ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 'নেড়ানেড়ীদের' আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে দলে দলে মুসলমান হয়ে যাওয়া থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তথাপি বৈষ্ণবায়িত উক্ত 'নেড়ানেড়ী'

গণের বহুপূর্বে থেকে পোষিত আচার-আচরণ বৈষ্ণব সমাজ ও আদর্শের হৃদয়মূলে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তা-থেকে কিছুটা সুস্থ ও উদার দৃষ্টি নিয়ে পূর্ণচন্দ্র (বা আউলচন্দ্র) নামক কোনো এক কাদেরীয় সুফী সাধক 'কর্তাভজা' ধর্মের পত্তন করলেন। এ বিষয়ে সে সময়ের কাল-পাত্র-ও স্থান তাঁর ধর্মমতের উপ্ত বীজকে দ্রুত অঙ্কুরিত হতে আলো-বাতাস ও জল দিয়ে সাহায্য করেছে। কারণ 'নেড়ানেড়ী'-সেবিত বৈষ্ণব-সহজিয়া মত, বাংলার দরিদ্রতম হিন্দু-মুসলমান এবং খড়দহ এই তিন থেকে 'কর্তাভজা', 'বয়াতি' ও ঘোষপাড়ার দূরত্ব আজকের বা সেদিনের বিচারে কতখানি ?

শ্রীচৈতন্য এবং ভারতীয় সঙ্গীত

প্রদীপ কুমার ঘোষ

১

এ কথা অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগের ভক্তিবাদী আন্দোলনের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। চৈতন্যদেব যুগধর্মকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতের পারম্পরিক ঐতিহ্যকেও সম্মান জানিয়েছিলেন—শুধু এটুকু বললেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে বলা শেষ হয়ে যায় না। সব চেয়ে বড়ো কথা যেটা তা হলো, তিনিই ভারতের প্রথম মহামানব যিনি গণ-সংস্কৃতির স্রষ্টা, যার শিকড়টি প্রোথিত ছিল প্রেম-রূপী গভীর মৃত্তিকায়। বৈদিক সাম্য ভাবধারায় বৈষ্ণব প্রেমকে জারিত করে তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়ী রসায়ণ আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তার প্রভাব শুধু ধর্মীয় চর্যায় সীমিত থাকে নি, তার সঞ্জীবনী শক্তি বাংলার সঙ্গীতকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিল। চৈতন্যোত্তর নাম-সঙ্কীর্তন ও পদাবলী কীর্তনই তার প্রমাণ। ধ্রুপদ-ধামার-খ্যাল গানের মতো নবাব-বাদশাদের কোনোরকম আনুকূল্য না পেয়েও কী করে একটি আঞ্চলিক অভিজাত সঙ্গীত বিগত পাঁচ শতাব্দী কাল যাবৎ সমগ্র পূর্ব ভারতের জন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ধ্রুপদের সমতুল্য শ্রদ্ধা আদায় করেছ এসব ভাবতে গেলেই আমরা বুঝতে পারি বাংলা গানে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দান কতোখানি।

২

চৈতন্য-সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হোল ধর্ম-চর্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি সমস্ত জিনিস-গুলির গণমুখী রূপ। এই সংস্কৃতি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত হলেও তার বিচরণ ছিল জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-বর্ণ নির্বিশেষে গণমানসে। চৈতন্য-সংস্কৃতির মূল সূত্রটি মানবতা-

বোধ, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ইত্যাদি সম্পর্কের দ্বারা বাঁধা আছে বলেই তার দৃঢ়তা, গভীরতা ও ব্যাপকতা এতো বেশী। হয়তো একারণেই তাঁর ধর্মে-সংস্কৃতিতে-সঙ্গীতে 'সবারে করি আহ্বান' আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধু-মাত্র চৈতন্য-প্রভাবিত সাঙ্গীতিক বিষয় নিয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

৩

চৈতন্য সমকালে বাংলা দেশের সঙ্গীত ছিল মুখ্যত দুপ্রকার—অভিজাত-দেশী গান এবং পল্লীগান। অভিজাত দেশী বা গান্ধর্ব-দেশী গানের জন্ম হয়েছে সুপ্রাচীন 'গান্ধর্ব সঙ্গীত' এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টিযুক্ত 'দেশীগান'-এর সমন্বয়ে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত, ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ছন্দোবিজ্ঞানের কঠিন নিয়মানুসৃত এবং গান্ধর্ব রাগাশ্রিত 'গান্ধর্ব-সঙ্গীত' অবলুপ্ত হলে, সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য নিয়ম-শৈথিল্যযুক্ত 'দেশীগান' গান্ধর্বের বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে 'অভিজাত-দেশী' বা গান্ধর্ব-দেশী-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শেষোক্ত গানকেই 'প্রবন্ধ' বলা হোত। প্রবন্ধের পূর্ব-পুরুষকে বলা হোত 'প্রকীর্ণ' বা 'পকীর্ণ' যাতে পল্লী-সঙ্গীতের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও একটা মোটামুটি নিয়ম-কানুন থাকতো। অবশ্য শিল্পী ইচ্ছে করলে গানে কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য যে-কোনো সময়েই সাঙ্গীতিক নিয়ম ভঙ্গ করতে পারতেন। প্রকীর্ণ প্রাচীন দেশীগানেরই এক উন্নত রূপ। দেশীগানে শিল্পীর প্রাধান্য স্বীকার করা হোত বলে সর্বদাই ছিল পরিবর্তনশীলতা বিবর্তনশীলতা। নিত্য নূতনত্ব এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই ছিল তার বৈশিষ্ট। প্রবন্ধগান উদ্ভূত হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দেশীগানের ওপর গান্ধর্ব বিজ্ঞান আরোপ করে। প্রবন্ধের সংখ্যা বহু হলেও নিয়ম-শুদ্ধতার বিচারে প্রবন্ধ ছিল মুখ্যতঃ তিন প্রকার—সূড়, আলি ও বিপ্রকীর্ণ। অর্থাৎ শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ। পরবর্তীকালে বিবর্তনের চাপে সূড় জাতীয় প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ নিয়ম-শৈথিল্য দেখা যায়, ফলে সূড় প্রবন্ধ 'শুদ্ধ-সূড়' ও 'সালগ সূড়'—এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

শুদ্ধ-সূড়ের অন্তর্গত ছিল ৮টি প্রবন্ধ—এলা, করণ ঢেঙ্কী, বর্তনী, ঝোম্বড়, একতালী লম্ভ ও রাস। আর সালগ-সূড়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাস ও একতালী। এছাড়া ছিল বর্ণ, বর্ণস্বর, গদ্য, কৈবাড় ইত্যাদি নামক ২৪ প্রকার আলি জাতীয় প্রবন্ধ এবং বহুপ্রকার বিপ্রকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস ইত্যাদি ৩৬ প্রকার প্রসিদ্ধ ছিল। এই সব বিচিত্র প্রবন্ধ চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিদেশী মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে দ্রুত বিবর্তিত হতে থাকে। বহু

প্রাচীন প্রবন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়, নতুন নতুন গীতবন্ধ জন্ম লাভ করে। যেমন, সালগ-সূড়ের অন্তর্গত 'ধ্রুব' নামক প্রবন্ধ বিবর্তিত হয়ে 'ধ্রুবপদ' বা 'ধ্রুপদ' গীতবন্ধে আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্রকীর্ণ জাতীয় 'চচ্চরী' প্রবন্ধ মথুরা-বৃন্দাবনে 'ধামার' গান রূপে বৈষ্ণব তীর্থে লালিত হতে থাকে। প্রাচীন কিছু প্রবন্ধকে আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটিয়ে জনপ্রিয় করা হয়, যেমন—চন্দ্রপ্রকাশ, ঝোমরা, পঞ্চতালেশ্বর, রাগকদম্ব, সর্বতোভদ্র, সূর্যপ্রকাশ, স্বরবর্তনী, ছন্দ, সাদ্রা, ধরু ইত্যাদি গীতবন্ধ। এছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উদ্ভূত হয় খ্যাল, গুলনক্স, কৌল প্রভৃতি গান। প্রাচীন প্রবন্ধ গানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাল-নামাশ্রিত প্রবন্ধ-নাম। প্রথম দিকে (এলা ও করণ বাদে) মোটামুটি যে যে নামের প্রবন্ধ, তালও সেই নামে ছিল। কিন্তু দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে এই ধারা ব্যাহত থাকে অর্থাৎ প্রবন্ধ-নাম ও তাল-নাম পৃথক হতে থাকে। প্রবন্ধে গান্ধর্ব ও দেশী উভয় শ্রেণীর রাগ ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রাচীন গান্ধর্ব রাগ ছিল ধ্বনি-বিজ্ঞানের চুল-চেরা নিয়মানুস্যত, সেখানে শিল্পীর স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করা হোত না। অপরপক্ষে, দেশীরাগে স্বরের একটা মোটামুটি কাঠামো থাকলেও ভাবপ্রকাশের তাগিদে অনিয়মিত স্বর ও নিয়ম-বহির্ভূত স্বরালঙ্কার শিল্পীরা ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারতেন। দেশী ও গান্ধর্ব রাগের তফাৎ বোঝার সহজ উপায় হোল—একই রাগ কীর্তন ও ধ্রুপদে কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা। দেখা যাবে কীর্তনে ব্যবহৃত রাগকে 'রাগ' বলে মনে হবে না। তালের ক্ষেত্রেও আমরা গান্ধর্ব ও দেশী প্রভাব সহজেই অনুধাবন করতে পারি। গান্ধর্ব তালে অক্ষর-ছন্দ এবং দেশী তালের ক্ষেত্রে গতি-ছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অক্ষর-ছন্দ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, তার গতি বা লয় পরিবর্তনেরও স্থির নিয়ম আছে। অথচ দেশী-তালে তালের গতি নির্ভর করে গীতি-কবিতার ভাবের ওপর। সে গতির কোনো নির্দিষ্ট ইউনিট নেই, তাল-মাত্রারও কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই, যদিও প্রত্যেক তালের প্রস্বন বা ঝোঁকগুলির মধ্যে একটা সুষম-সম্পর্ক থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং পালাকীর্তনে যে বিলম্বিত লয়যুক্ত তাল ব্যবহার করা হয়, তা হচ্ছে প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গতালের বিবর্তিত অবস্থা এবং মধ্য ও দ্রুতলয়ের তাল হচ্ছে দেশী নিয়মানুস্যত। বাংলার কীর্তনে বিলম্বিত লয়ের তাল ও গান্ধর্ব রাগ ও রাগালাপ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন নরোত্তম ঠাকুর, খেতরীর উৎসবে (ষোড়শ শতকের শেষভাবে)। কালবশে কীর্তনের সেই রীতি আজ বহুলাংশে লুপ্ত।

শ্রীচৈতন্যের সমকালে বাংলার অভিজাত সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হোল বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং বৈষ্ণব সঙ্গীত-শাস্ত্রী হরিনায়ক লিখিত

'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থ দুটিকে বিশ্লেষণ করা। এর সঙ্গে কোষ গ্রন্থ হিসাবে নিঃশঙ্ক-শাঙ্গর্দেব রচিত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থটিকে অবশ্যই আমাদের কাছে রাখতে হবে। বিশ্লেষণে আমরা বুঝতে পারি, সমগ্র উত্তর ভারতে যখন গোয়ালিয়র-নরেশ মানসিংহ প্রবর্তিত নব্য-ধ্রুপদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে, তখন বাংলায় বিবর্তিত প্রাচীন প্রবন্ধগুলি অনুশীলিত হচ্ছে। আভিজাত্যের বিচারে বাংলায় প্রচারিত প্রবন্ধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ। সংক্ষিপ্ত রাগালাপ, চতুর্ধাতু (উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ) ও ষড়াঙ্গ (স্বর, পদ, তাল, তেন, বিরুদ ও পাট) সমন্বিত গীতবন্ধকে শুদ্ধ প্রবন্ধ বলা হোত। ধাতু ও অঙ্গের হেরফের ঘটিয়ে যথাক্রমে সালগ ও সংকীর্ণ প্রবন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। চৈতন্যযুগে প্রাচীন প্রবন্ধগুলি লুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র মাতৃকা, স্বরার্থ, এলা, পঞ্চতালেশ্বর ও বর্ণস্বর নামক তাৎকালিক বিচারে শুদ্ধ প্রবন্ধগুলি পূর্ব-ভারতে, বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গে, প্রচলিত ছিল। যদিচ হরিনায়ক বলেছেন: "ভেদঃ শুদ্ধ প্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি।" অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবন্ধের সংখ্যা অনন্ত। অথচ প্রাচীন বিচারে তা হওয়া উচিত নয়। সালগ বা সালগ-সূড় প্রবন্ধের নামগুলি অধিকাংশই প্রাচীন নামের সঙ্গে মিললেও আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং দুএকটি প্রাচীন সংকীর্ণ বা বিপ্রকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ প্রমোশন পেয়ে সালগ সূড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সময়ে নটি সালগ শ্রেণীর প্রবন্ধের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যেমন—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, রাস, প্রতিতাল, একতালী, যতি ও ঝুমরী (ঝোম্বর)। ঐ সংকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ বা ক্ষুদ্রগীত ছিল মাত্র চার প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী।

আমরা জানি, গৌড়বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক গানগুলিকে 'কীর্তন' বলা হয়। এই কীর্তন মূলতঃ দুপ্রকার—নাম-কীর্তন ও পালাকীর্তন। চৈতন্য পরবর্তীকালে 'কীর্তন' এক পৃথক রীতির গানশৈলীরূপে উদ্ভূত হলেও প্রাক্‌চৈতন্য যুগে 'কীর্তন' নামে কোন স্বতন্ত্র গীতবন্ধ বা প্রবন্ধ ছিল না। না থাকাই স্বাভাবিক। ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি আবহমান কাল থেকে দুই ধারায় বিভক্ত—বৈদিক ও লৌকিক। বৈদিক কৃষ্টি বেদান্ত সাপেক্ষ এবং তা উচ্চকোটীর শিক্ষিত মনুষ্য সমাজ দ্বারা আদৃত। অপর পক্ষে, লৌকিক কৃষ্টি ছিল প্রকৃতিতে দেশজ। তাই তা ছিল সাধারণ মনুষ্য সমাজে স্বীকৃত ও জনপ্রিয়। বৈদিক ধর্মে বিচার-বিমর্শই প্রধান উপজীব্য, তাই বেদ-নির্ভর সমাজের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত হচ্ছে বৈদিক সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে ভাব নেই, আছে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন। কিন্তু লৌকিক ধর্মীয় সঙ্গীত হচ্ছে ভাবের সঙ্গীত। উচ্চ-ভাবই তার মুখ্য উপজীব্য। সুর-তাল সেখানে ভাষার বাহন মাত্র। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ গানের যুগে

অর্থাৎ অভিজাত দেশীগানের যুগে দেখা যায় যে, বেদান্ত অনুগামী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি প্রবন্ধ গানের কয়েকটি বিশেষ রূপকে তাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেমন, চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণবগণ সম্ভবতঃ সূড় বা শুদ্ধ জাতীয় এলা, করণ ও ঝোম্বড় প্রবন্ধের বিশেষ কয়েকটি প্রকারকে, সালগ-সূড় জাতীয় ধ্রুব প্রবন্ধের কয়েকটি প্রকারকে এবং বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের দুএকটি প্রকারকে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যদি শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থের 'প্রবন্ধাধ্যায়'-টি ভালো করে পড়ি তাহলে আমার অনুমানকে অমূলক মনে হবে না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

কেন বৈষ্ণবগণ প্রবন্ধকে তাঁদের ধর্মীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে মুখ্যতঃ দুটি কারণ প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ, যে ভক্তি-মার্গকে আশ্রয় করে বৈষ্ণব দর্শন সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবাপ্লুতা। যার নিউক্লিয়স ছিল প্রেম। বৈদিক সঙ্গীত এবং বৈদিক রীতি আশ্রিত গান্ধর্ব সঙ্গীতে ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ছন্দোবিজ্ঞানের শৃঙ্খলা সর্বস্তরে জড়িয়ে থাকায় ভাবাপ্লুতা প্রকাশের বিশেষ অবকাশ থাকে না। এই সঙ্গীতদ্বয়ের কাব্যাংশে ইষ্টদেবতার বর্ণনা থাকলেও নায়ক এবং ইষ্টদেবতার অহেতুক প্রশংসা রীতি-বিরুদ্ধ। তাছাড়া ইষ্টদেবতাদের সঙ্গে লৌকিক উপাখ্যানও জড়িত করা হয় না। অথচ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশী সঙ্গীতে এবং গ্রাম্য-সঙ্গীতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র দেখা যায়। অভিজাত দেশী বা প্রবন্ধে গান্ধর্ব ও দেশীর এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। এতে একদিকে যেমন ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ছন্দো-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি আবার কাব্যাংশের গুরুত্ব সমানভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধে রাগরস ও কাব্যরস মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অবশ্যই সূড় ও সালগ-সূড় জাতীয় প্রবন্ধে। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক ধর্মের তুলনায় আচার-ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে কম মেনে চলে, হোম-যজ্ঞের বাড়াবাড়ি নেই, তুলনায় অনেক উদার এবং সর্ববর্ণিক। সুতরাং সর্ব বর্ণের উপযোগী যে প্রবন্ধ গান, তাকেই গ্রহণ করা বৈষ্ণবগণ উপযুক্ত মনে করেছিলেন। বৈদিক ও গান্ধর্ব সঙ্গীত বেদোত্তর যুগে পুরোহিত প্রাধান্যের জন্য সর্ববর্ণিক ছিল না।

৪.

এবার নাম-কীর্তন ও পালাকীর্তনের প্রসঙ্গে আসা যাক্। বৈষ্ণবগণ সাধারণ অশিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত এবং সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ মানুষদের জন্য 'নাম-কীতন' বিধি নির্দেশ

করেছেন। নামকীর্তনে ইষ্টদেবতার নাম সরল সুরে ও তালে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়। বৈষ্ণবদের নামকীর্তনে 'হরি', 'কৃষ্ণ' ইত্যাদিদের আরাধনা করা হয়। বৈষ্ণব মতে নববিধা ভক্তির প্রধান সাধন নামকীর্তন। নাম থেকে প্রেমের উদয় হয়। নাম করতে করতে ভক্তের বাহ্যিক সত্তা লুপ্ত হয় অর্থাৎ তিনি 'আবেশ' প্রাপ্ত হন। পূর্বে হরিকীর্তন ও নামকীর্তনে 'রাগ' বস্তুটি ছিল না। থাকা উচিতও নয়। কারণ রাগ-সঙ্গীত জনগণের সঙ্গীত নয়। তাই নামকীর্তনে রাগের স্থলে 'ধুন' বা দেশী সুর প্রয়োগ করা হতো। নামকীর্তনের কাব্যাংশের উদাহরণ হচ্ছে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।' এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে 'নিত্য ও লীলা'-র ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নামকীর্তনে শুধু ইষ্টদেবতার নামটুকু ধরে রাখা হয়েছে—অর্থাৎ 'নিত্য'-কে বা 'ধ্রুব'-কে প্রকাশ করা হয়েছে। বৈষ্ণবেরা ইষ্টের 'লীলা-কে প্রকাশ করেন তাঁদের 'লীলাকীর্তন'-এ বা পালাকীর্তন-এ।

নামকীর্তনের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মুখ্য অবদান হলো, নামকীর্তনকে নামসঙ্কীর্তনে রূপান্তরিত করা। নামকীর্তন ও 'সঙ্কীর্তন' এক বস্তু নয়। 'সম্' শব্দের অর্থ সাঙ্গীতিক বিচারে দুপ্রকার—সমবেত এবং সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সঙ্কীর্তনে একই সঙ্গে নিত্য ও লীলাকে সমন্বিত করা হয়েছে। এতে আছে একদিকে শুধু ইষ্টনাম উচ্চারণে নিত্যের কীর্তন, অপরদিকে রয়েছে বিচিত্র রস-সমন্বিত রাগ রাগিণীর সুর এবং বিভিন্ন তাল দ্বারা ইষ্টের লীলা সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত। এই লীলাকে প্রকটিত করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্কীর্তনে 'ভাব-নৃত্য' (দেশী-নৃত্যের এক প্রকার) সংযোজিত করেছিলেন। চৈতন্য-পূর্ব যুগে যে নাম-কীর্তন একঘেঁয়েমির বিপাকে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্পর্শে তা উজ্জীবিত হয়ে এক মহাশক্তিরূপী সঙ্কীর্তনে রূপান্তরিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমবেত ভাবে লীলায়িত হতো এবং তাতে খোল (মৃদঙ্গ), শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এও নামকীর্তনের ক্ষেত্রে এক অভিনব জিনিস।

চৈতন্যদেব নামকীর্তনের কিছু প্রকারভেদ ঘটিয়ে বেড়া-কীর্তন, উদ্দণ্ড-কীর্তন, সৃষ্টি করেছিলেন। কীভাবে তিনি এর প্রকারভেদ ঘটিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। বোঝা যায় না এই কারণে যে, তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যাপারটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে অনুমান হয়, এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, অদ্বৈত গোস্বামী, নরহরি সরকার

প্রভৃতি তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ শিষ্যগণ। সেকালে এঁরা সবাই গৌড়বঙ্গের খ্যাতনামা সঙ্গীতগুণী ছিলেন।

সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি সঙ্গীতকে গণ-অন্দোলনের হাতিয়ার করেছিলেন। সঙ্গীত যে একটা শক্তি এবং সেই শক্তির একটা বিধ্বংসী রূপও রয়েছে—এই পরম সত্যটি শ্রীচৈতন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। নবদ্বীপের মুসলিম কাজীকে যখন কয়েকজন বৈষ্ণব-বিরোধী ব্রাহ্মণ এবং গোঁড়া-মুসলিম পরিষদ চৈতন্য-সম্প্রদায়ের হরি সঙ্কীর্তন বন্ধ করার জন্য উত্যক্ত করলো, তখন উক্ত কাজী একদিন সরেজমিনে এসে জনৈক গৃহস্থের করতাল কেড়ে নেয় এবং মৃদঙ্গ ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর কাজী এক আদেশ জারী করে নবদ্বীপে উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন বন্ধ করে দেয়। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত শ্রীচৈতন্য কাজীর আদেশ অমান্য করেন। সেদিন তাঁর আহ্বানে শত শত নবদ্বীপবাসী সাড়া দিয়েছিলেন।

এটা ঠিকই যে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত রাগ-তালাশ্রিত সেই সঙ্কীর্তন আজ আর অবিকৃতভাবে বেঁচে নেই, পড়ে আছে শুধু তার কঙ্কাল। তবু বর্তমান সঙ্কীর্তনে যে আবশ্যিকভাবে নৃত্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে তা শ্রীচৈতন্যের অক্ষয়-কীর্তিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার পালা-কীর্তনের কথায় আসছি। পালা-কীর্তন বা রসকীর্তনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হোল—পালা আকারে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা বা উপাখ্যানের অবতারণা। এর গেয় বস্তু নিঃসন্দেহে সুকঠিন এবং দীর্ঘ অনুশীলন-সাপেক্ষ, বিশেষতঃ প্রাচীন কীর্তন যা প্রাবন্ধিক রীতি অনুসৃত এবং দেশী রাগ ও কঠিন তালযুক্ত গান। চৈতন্য-পূর্ব যুগে যে পালাকীর্তন প্রচলিত ছিল, তা ছিল পুরোপুরি প্রাবন্ধিক রীতি অনুসারী; বিশেষতঃ আঙ্গিকের দিক থেকে। তবে তার তাল ও রাগ-রাগিনী ছিল দেশী প্রকৃতির অর্থাৎ নিয়ম-শৈথিল্যযুক্ত। খুবই স্বাভাবিক। কারণ বেশী ভাবের গানে কখনোই গান্ধর্ব সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রয়োগ করা যায় না। তাতে বাণী, সুর ও তালের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু রস-কীর্তন বা পালা-কীর্তনের মুখ্য উপজীব্য যে নাটকীয়তা তাতে পদের প্রাধান্য দিতেই হয়। যাই হোক্, প্রশ্ন হল পালা-কীর্তনে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানই বা কী।

সত্যিকথা বলতে কী পদাবলী-কীর্তনে মহাপ্রভুর কোনো প্রত্যক্ষ অবদান নেই। কেন নেই, সে কথা অনুমান করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। প্রথমতঃ, পদাবলী কীর্তন সঙ্গীত-বোদ্ধাদের গান, সাধারণ মানুষের গান নয় অর্থাৎ গণ-সঙ্গীত নয়। কাজেই এ গান

শ্রীচৈতন্য প্রচারিত 'গণমুখী' বৈষ্ণব-ধর্মের উপযোগী নয়। যতক্ষণ না বৈষ্ণব ধর্মের দর্শনে স্বচ্ছ প্রতীতি জন্মাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পদাবলী কীর্তনের রস আস্বাদন করা যাবে না। যদিচ চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণ পদাবলী কীর্তন খুবই শুনতেন এবং ভালোবাসতেনও। তবু বলতে কুণ্ঠা নেই, এই জাতীয় গানে উদ্দীপনা আনে না এবং তা ধর্মীয় আন্দোলনের পক্ষেও উপযোগী নয়। দ্বিতীয়তঃ, পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক-বিন্যাস ও সুর-তালের পরিবর্তন ঘটিয়ে কোনো নবতর গীতরীতিতে রূপান্তরিত করার মতো সময়ও চৈতন্যদেব পাননি। শুধু এটুকু আমরা অনুমান করতে পারি যে, তিনি নৃত্য পছন্দ করতেন এবং পদাবলী কীর্তনের প্রতি পালার শেষভাগে সে সময় দ্রুতলয়ে গান সন্নিবেশিত হতো—সে ক্ষেত্রে হয়তো বা তিনি ঐ অংশে নৃত্যের সংযোজন করে থাকতে পারেন। আর পালা-কীর্তন বা পদাবলী কীর্তনে যে বহুবিধ রস প্রয়োগের বিধি ছিল, মহাপ্রভু সম্ভবত তাঁর ধর্মীয় দর্শনের অনুসারী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের কীর্তনই অধিক পছন্দ করতেন।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মহাপ্রভুর পরোক্ষ প্রভাবেই পরবর্তী কালে পদাবলী কীর্তন এক বিশিষ্ট শৈলীর অভিজাত সঙ্গীতে উন্নীত হয়। এ ব্যাপারে প্রধান ঋত্বিক ছিলেন পরম বৈষ্ণব সঙ্গীতজ্ঞ নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। তিনিই কীর্তনে গান্ধর্ব রাগ-আলাপ ও গান্ধর্ব রীতি অনুসৃত তাল সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন। গীতারম্ভের পূর্বে শ্রীচৈতন্যের বন্দনামূলক 'গৌরচন্দ্রিকা' নামক গীতাংশটি যুক্ত করেন এবং কীর্তন-গায়ক ও শ্রীখোলকে মাল্যদান প্রথা চালু করেন। যে সময়ে ভারতীয় অভিজাত সঙ্গীতকে সঙ্গীতোপজীবীগণ নবাব-বাদশাদের মনোরঞ্জন করার জন্য দরবারে 'ভেট' দিয়ে সঙ্গীতের মান অবনত করতে এবং নিজেদের আখের গুছতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় এই বাংলায়ই অভিজাত সঙ্গীতকে একটা দর্শনের আধারে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। এই দর্শন শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যা উত্তরকালের অভিজাত পদাবলী কীর্তন শৈলী সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজকের কীর্তনে নরোত্তম ঠাকুর প্রচারিত গান্ধর্ব রাগ-তালের ব্যবহার আর দেখা যায় না। তার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ কয়েকটি বিশেষ টাইপের সুর ও তাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বে আজকের পদাবলী-কীর্তন শ্রীচৈতন্য প্রচারিত দর্শনের ঐতিহ্য থেকে সরে আসেনি। আমাদের ভুললে চলবে না, চৈতন্যদেব সেকালে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর ধর্মমত গণমুখী হলেও তার পরিণতি কিন্তু জ্ঞানমার্গেই, দর্শনের রাজ্যে তার চাবিকাঠিটি গচ্ছিত।

ভক্তিভাবনার ত্রিধারা

বিজিতকুমার দত্ত

কবীর, নানক, চৈতন্যের আবির্ভাব বিশেষ এক সামাজিক পরিমণ্ডলে ঘটেছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের প্রবেশ এবং একে একে ভারতের রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে এই যোদ্ধাদের শাসনভার-গ্রহণ ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। শাসকের ভূমিকায় ভিন্ন ধর্মের মানুষ যখন এল তখন সামাজিক ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় মানসে এক প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য এর আগেও বিদেশী সমরলিপ্সু যোদ্ধা জাত ভারত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তারা ভারতে মুসলমান শক্তির ভূমিকায় দেখা দেয়নি। মুসলমান ধর্ম তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধর্মের উদার আহ্বানে সাড়াও দিয়েছিল বিভিন্ন দেশ। যারা সাড়া দেয়নি রক্তাক্ত পথে শেষ পর্যন্ত অনেক দেশই এই ধর্ম মেনে নিয়েছিল। ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম ঘটল কিছুটা। দীর্ঘকাল ধরে যে হিন্দুধর্ম নানা ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করে দাঁড়িয়েছিল সে ধর্ম সহজে মেনে নিতে চায়নি ইসলামকে। যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও সংস্কৃতি, সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম টিকে থাকবার সাধনায় দৃঢ়তা দেখাল।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৯) যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন দিল্লীতে পাঠান সুলতান। সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে দৌলৎখান পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। নানকের মুখ্য ভূমিকা দৌলৎখানের সময় দেখা গিয়েছিল। দৌলৎখানই বাবরকে আহ্বান করেছিলেন দিল্লী জয় করতে। বাবর নির্বিচারে যে হত্যাকাণ্ড করেছিলেন নানক তার সাক্ষী। বাবরের সম্বন্ধে নানকের মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নানকের উক্তিতে পাই অনেক, 'অনেক মানুষ তাদের ধনদৌলতের জন্য ধ্বংস হয়েছে।' আর একটি ভজনে পাই, 'ধন এবং রূপ মানুষের শত্রু হয়ে উঠল—এই ধনদৌলত এবং রূপই তাদের বিলাসব্যসনে প্রলুব্ধ করল।' স্পষ্ট করে নানক বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান-রাজপুত

নারীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত লজ্জাবরণ ছিঁড়ে ফেলা হল, বাকিদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হল।' ঐতিহাসিকেরা বলেন মুসলমানরা ধর্মপ্রচারের জন্য নয়, লুণ্ঠনের জন্যই বারবার ভারত আক্রমণ করেছিল। যদিও একথা ঠিক নানকের সময় পাঞ্জাবে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল। কবীরের সময়েও পাঠানরাই ভারতবর্ষের শাসক। কবীর (১৪৪০-১৫১৮) মুসলমান ধর্মের অগ্রগতি লক্ষ্য করেছিলেন। ইসলামের নূতনত্ব কবীরকে খানিকটা আকর্ষণও করেছিল। নানকও ইসলামধর্মের সার অনুধাবন করেছিলেন। চৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) সময়ে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী আমল। চৈতন্যের আবির্ভাবের সময় পাঠান সুলতানদের অন্তর্কলহ প্রশমিত। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সুলতানরা তরবারি নিয়ে ধর্মপ্রচারে কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নেই। তবে ধর্মান্তর যে ঘটছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ধর্মান্তর সমগ্র ভারতবর্ষেই ঘটেছে।

এরই প্রতিক্রিয়ায় কবীর নানক চৈতন্য নবধর্মের সূচনা করেছিলেন এইরকম সরলীকরণ অনৈতিহাসিক হবে। আসলে ইসলামী শাসনের গোড়ার দিকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক শ্রেণীর মানুষের চিত্তে দ্রোহবুদ্ধি দেখা দিয়েছিল। এই দ্রোহবুদ্ধির অপর নাম ভক্তি আন্দোলন। কবীর নানক চৈতন্য তিনজনই ভক্তিপথের সাধক। এই ভক্তিবাদের উৎস দক্ষিণ ভারত। তামিল সন্ত (ষষ্ঠ শতক) তিরুমুলর বলেছিলেন ঈশ্বর এক এবং একটিই জাতি, তা হল মানুষ জাতি। তিরুমুলর বলেছেন দেবতাকে নৈবেদ্য দিলে মানুষের কিছু হয় না বরং মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন তাকে নৈবেদ্য দাও। তিরুমুলর প্রেমকেই দেবতা বলেছেন। দেবতাকে সেবা যে করে যত নীচবর্ণের হোক না কেন সে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। শৈব নয়নময় এবং বৈষ্ণব আলবার সম্প্রদায়ের এই উদার দৃষ্টি ভক্তির পথ ধরেছিল। আলবার সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের রচনাবলী লেখেননি, লিখেছিলেন দেশীয়ভাষায়। যদিও সংস্কৃতকে তারা পরিত্যাগ করেননি। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মর্ম আলবার সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধনারই ফল। কিছুকাল পরে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিধিবিধানের জট দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। তখন সিদ্ধরা এলেন। এরা নাথযোগীদের কাছাকাছি। সিদ্ধরা জাতিভেদ প্রথাকে ধিক্কার দিলেন। বিধিবিধানের জটিলতা থেকেও মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন সিদ্ধসাধকবৃন্দ। কবীর নানক চৈতন্য সকলেই ছিলেন যাত্রী। এই যাত্রাকে বলা যায় ভারত আবিষ্কার। কেউ কেউ বলেন ভারত পন্থের সাধনা। নানক তো প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। এমন কি তিনি মক্কা মদিনাতেও

গিয়েছিলেন। কবীর অবশ্য অপর দুজনের তুলনায় খুব বেশী ভ্রমণে যাননি। কিন্তু চৈতন্য দক্ষিণভারত ও উত্তরভারত পরিক্রমা করেছিলেন। কবীর রামানুজের শিষ্য রামানন্দের শিষ্য। অতএব দক্ষিণ ভারতের নয়নময় এবং আলবার সম্প্রদায়ের কথা তাঁর জানবার কথা। চৈতন্যের দক্ষিণভারত ভ্রমণ সেদিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নানকও দক্ষিণভারতে এসে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অতএব তিনজনের ধর্মমতে ভক্তিমার্গের প্রতি আনুগত্যের উৎস কি ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অবশ্যই এবং ঠিকই বলবেন ভক্তির কথা উপনিষদেই আছে, গীতাতে তো আছেই। কিন্তু ভক্তিকে ধর্মীয় এবং সামাজিক দিকে মূল্যবান করে তুলেছিলেন দক্ষিণভারত এবং অনুকূল পরিবেশে তাই উপ্ত হল ভারতের অন্যত্র। এই অনুকূল পরিবেশ বলতে বুঝি ভারতবর্ষে মুসলমানধর্মের প্রবেশ এবং তারই ফলে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

ঐতিহাসিকবৃন্দ বলেন ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অস্ত্রবলে হয়নি, অনেকটাই হয়েছিল সুফী সাধকদের দ্বারা। ঐতিহাসিক কিশোরী সরণ লাল বলেন 'Large scale conversion of the Hindus were due not to the efforts of the rulers, ulma or mulla but there of the sufi saints' (Guru Nanak, A Homage Sahitya Akademi, 'Guru Nanak's Punjab : 1469-1539, by Dr. S. S. Danaj প্রবন্ধের পাদটীকা)। সুফী সাধকবৃন্দ ভারতবর্ষে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। তাঁদের আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় মতামতে উদার মনোভাব গ্রহণ ভারতবাসীর মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। শেখ মঈনউদ্দীন চিশ্‌তীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সর্বোচ্চ ভক্তির নিদর্শন কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন অবহেলিত গরীব দুঃখী মানুষের সেবাই সর্বোচ্চ ভক্তির নিদর্শন। সুফী সাধকবৃন্দ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁদের আস্তানাকে বলা হত 'খানকাহ'। সুফী সাধকের অনুগামীবৃন্দ এই খানকাহ-তে বিনা পয়সায় থাকতে ও খেতে পারত। নিম্নশ্রেণীর গরীব হিন্দুরাও এই খানকাহ-তে বাস করবার জন্যে আসত। বলা-বাহুল্য সুফী সাধকদের এই জীবনচর্চা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। ভক্তিবাদের সঙ্গে সুফী সাধকদের সাধনার যথেষ্ট মিল ছিল। কবীর সম্বন্ধে বলা হয়:

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড ॥

সুফী সধনার সঙ্গে নানকও পরিচিত ছিলেন। ভারতের সুফী সাধকদের তিনি

তো জানতেনই। যখন বিদেশে গিয়েছেন বিশেষ করে মক্কা মদিনায় তখনও তিনি এদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'He made friends with the Muslim Fakirs in there countries, and they were also impressed by his profound religiosity and his looking upon all human beings equal as the creation of God.' চৈতন্যের সঙ্গে সূফী সাধকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু চৈতন্য নিজেকে বাউল বলেই পরিচয় দিয়েছেন। জীবনসায়াহ্নে তার আর্তির মধ্যে বাউলের ভাবই প্রকাশিত হয়েছিল। চৈতন্যচারিতামৃতে বিরহকাতর চৈতন্যের স্বরূপদমোদর এবং রায় রামানন্দের প্রতি এই উক্তিটি স্মরণীয় :

সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণালাউ কালি ধরি
আশা ঝুলি স্কন্ধের উপর ॥
* * *
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।

বাউলের সাধনার সঙ্গে সূফী সাধনার যোগ ঘনিষ্ঠতর। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখিয়েছিলেন বাউলের সাধনায় সঙ্গীতের স্থান খুব উঁচুতে। আর এই সঙ্গীত প্রিয়তা সূফী সাধনা থেকেই এসে থাকতে পারে। শৈব নয়নমর এবং বৈষ্ণব আলবার সম্প্রদায়ও সঙ্গীতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নানক কবীরের বাণী গানেই লিপিবদ্ধ আর চৈতন্যের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা তো সর্বত্র উল্লিখিত। নানকের গানের প্রতি যে পক্ষপাত লক্ষ করা যায় তা অভূতপূর্ব। তিনি মার্গসঙ্গীতের প্রায় সব রাগকেই গ্রহণ করেছিলেন। সুনীতিবাবু বলেছেন কেবল মার্গসঙ্গীত নয় লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যকেও নানক স্বীকার করেছিলেন। বাংলার কীর্তনগানে—যা চৈতন্যও শুনতেন এই মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য স্বীকৃত। কবীরের দোহাতেও সেই স্বীকৃতি। বাংলাদেশে ফকীর দরবেশরা যথেষ্টই এসেছিলেন। এমন কি তারা কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনেও প্রভাব বিস্তার করেছেন। আসরফ খাঁ কিমজানীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বাংলার সহরে পল্লীতে অসংখ্য পীরের আস্তানা দেখে সূফী সাধনার দিকটি যে কত বিস্তৃত ছিল তা বোঝা যায়। সিলেটে শাহজালাল, চট্টগ্রামে বদর সাহেবের কথা সকলেরই জানা। সুতরাং ইসলামের বিস্তৃতি এই পথেই ঘটেছিল।

আরও একটি ধারার কথা এইখানে বলে নিই। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সাবলীল

প্রবাহ হিন্দুসমাজকে গতিসম্পন্ন করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারি বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিধিবিধানের দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠছিল। উচ্চকোটি সমাজের ব্রাহ্মণ এমন কি ক্ষত্রিয়ও এই কঠোর বিধিবিধানের ছায়ায় পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিল। শাস্ত্রের দিক থেকে মূর্তিপূজা, ব্রতউপবাস, মন্ত্রতন্ত্রের প্রাধান্য ঘটতে আরম্ভ করল, জতিভেদপ্রথা, বিধবাবিবাহ বন্ধ, সতীদাহপ্রচলন ঘটল। ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ ও বজ্রযানী, মহাযানী বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একদিকে সহজিয়া পন্থের নাথপন্থের উদ্ভব এই প্রতিক্রিয়ার ফল। পাঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে প্রায় তিনশ বছর হয়ে গেছে মুসলমানের রাজত্বকাল। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তখন নূতন করে আশ্রয় খুঁজছিল। কিন্তু সেকথা পরে। এই যে নাথপন্থের সাধনা তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল। যোগপন্থাও সেই। কবীর নানক এবং চৈতন্যের ধর্মমতে এঁদের প্রভাব গুরুতর। নানকের 'জপজীতে, কবীরের দোহায় এবং চৈতন্যের আর্তিতে এই সহজ সাধনার কথাই বারবার বলা হয়েছে। নানক বলছেন চাতক যেমন বারিবিন্দুর জন্যে তৃষিত, মাছ যেমন জলে আনন্দ পায়, নানকও তেমনি তৃপ্ত ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে। কবীর বলছেন, 'রমইয়া গুণ গাইঐ রে জাতৈঁ পাই ঐ পরম নিধাঁনু॥ / সুরগবাসু ন বাঞ্ছিঐ ডরিঐ ন নরকি নিবাসু। / হোঁনাহৈ সো হোইহৈ মনাইঁ ন কী হৈ আসু॥ / ক্যা জপ ক্যা তপ সংযমো ক্যা ব্রত ক্যা অসনঁ ন।' (ওরে রামের গুণগান কর, যাতে করে পরম-নিধানকে পাবে। স্বর্গবাসের বাঞ্ছা করো না, করো না নরকবাসের ভয়। যা হবার তাই হবে। মনে কোনো আশা রেখো না। যতক্ষণ যুক্তি দিয়ে ভাবভক্তি দিয়ে ভগবানকে না জেনেছ ততক্ষণ জপ, তপ, সংযম, ব্রত, স্নান, এসব দিয়ে কি হবে। 'ভক্ত কবীর' উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃ ২৬৮) বলাবাহুল্য দেশ তখন সামন্ততান্ত্রিক। শাসক ও শোষকের ভূমিকা সামন্ততান্ত্রিক প্রথাতেই চলছিল। নীচ আরও নীচ হচ্ছিল, উচ্চ আরও উঁচুতে উঠছিল। রমিলা থাপার তাঁর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে সাধুসন্তদের আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে এই ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজব্যবস্থার উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) গ্রন্থে নবীন আর্য ও প্রবীন আর্যদের কথা বলেছেন। নবীন আর্যরা ব্রাহ্মণ্য শাসনকে আষ্টেপৃষ্টে কঠোর বন্ধনডোর দিয়েছিলেন। প্রাচীন আর্য নিম্নকোটি সমাজের সঙ্গে আপোষ করেছিল। এই সূত্রে মনে হয় আর্যদের বিশেষ গোষ্ঠী পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা

বেদ মানতেন উপনিষদ জানতেন এমন কি পৌরাণিক ধর্ম সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, কিন্তু আরও কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে ছিল। যথার্থ যোদ্ধা জাতি বলতে আমরা যে বলদৃপ্ত মানুষ বুঝি সেই আর্যরা পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলেই বসবাস করেছিলেন। নানক তাঁদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছেন। এই ধর্ম দুর্বলকে রক্ষা করে, শুধু তা নয় আত্মরক্ষায়ও তৎপর হতে আহ্বান করে। নানকের ধর্মে আমরা দুই-ই পাই। আসামে মায়ামরীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রতেজের অভাব ছিল না। প্রয়োজনে তারা হিংসাত্মক—বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু কবীর এবং চৈতন্যের ধর্মজিজ্ঞাসায় ধর্মগুরুরা কখনই বাহুবল বা অসিধারণে সক্ষম ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য সম্বন্ধে সপ্রশংস হয়েও বৈষ্ণব সাধনার এই দুর্বলতার দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আমাদের দেশের রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই।······বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা, হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে সে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।' লক্ষ করলে দেখা যাবে নানকের শিক্ষাতেও পৌরাণিক হিন্দু দেব দেবতা এবং মানুষের কাহিনী স্বীকৃত হয়েছে। পুরাণের দেবদেবতার পৌরুষবাহিক দিকটির প্রতিই সেখানে গুরুত্ব। চৈতন্যচরিতামৃতে যেসব পুরাণকথা আহৃত হয়েছে তাতে মধুর দিকটিই উদ্‌ঘাটিত। বৃন্দাবনদাস অবশ্যই কিছু তেজ বিকিরণ করেছিলেন কিন্তু সে তেজ কিছুকালের মধ্যে লাবণ্যে 'অবনী বহিয়া যায়।' চৈতন্যই এর উৎস কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

কবীর নানক চৈতন্য সকলেই বিবাহিত। কবীর নানক সংসার পরিত্যাগ করেননি। চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তিন ধর্মনেতার জীবনাদর্শে চৈতন্যের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটুকু গুরুতর। কিছু ভ্রাম্যমান ফকীর নানককে সংসারী থাকবার জন্যে যখন বিদ্রূপ করেছিলেন তখন নানক বলেছিলেন, 'আওরৎ—আমান; পুত্তর—নিশান; দৌলৎ—গুজরান।' অর্থাৎ 'স্ত্রী হচ্ছে জীবনে বিশ্রামের ভূমি, পুত্র হচ্ছে গৃহীর সাক্ষী, ধনদৌলৎ হচ্ছে মানুষের জীবননির্বাহের স্মারক।' নানক এমন কি তাঁর বড় পুত্র শ্রীচাঁদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি এই কারণে যে শ্রীচাঁদ ছিলেন সংসার ত্যাগী উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। কবীরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় থাকলেও মোটামুটি জানা যায় কবীর বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী লুই, পুত্রের নাম কমাল,

কন্যা কমালী। সংসার জীবন সম্বন্ধে কবীর বিরূপতা প্রদর্শন করেননি। চৈতন্যের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত কোনো সংবাদ আমরা পাইনা। চকিত যেটুকু পাই তিনি সংসার নিয়ে অসুখী হননি। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর ধীরে ধীরে সংসারিক জীবন সম্বন্ধে চৈতন্য নিবৃত্ত হয়ে পড়েন। ধনজন স্ত্রী সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন চৈতন্য। এই থেকে এ অনুমান করা কি সম্ভব যে চৈতন্য সন্ন্যাসজীবনকেই একমাত্র আদর্শ জীবন বলে মনে করতেন? আমরা জানি নীলাচলে চৈতন্য নারীসংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু এও জানি ভক্তেরা যখন সপরিবারে নীলাচলে আসতেন তখন তিনি নেই পারিবারিক জীবনের মাধুর্যটুকু সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। নিত্যানন্দ থেকে অদ্বৈত বিবাহিত জীবনই যাপন করেছেন। এঁদের সন্তানদিও ছিল। চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিন্তু সকলে সন্ন্যাস নিক এ ধারণাকে প্রশ্রয় দেননি। তথাপি চৈতন্যের সন্ন্যাসের জন্যে গৃহী বৈষ্ণবের কাছেও আদর্শ হয়ে রইল বৈরাগ্য সাধনে কৃষ্ণে সমর্পণের আকুতি। কবীর নানক গৃহী হওয়ার জন্যে গৃহজীবনই ধর্মপথের সহায় এবং অবলম্বন এ বিশ্বাস কবীরপন্থী এবং নানকপন্থীদের মধ্যে দেখা দিল। সমাজ আন্দোলনে কবীর নানকের এই পথ নিঃসন্দেহে বাস্তবমুখিতার পরিচায়ক। চৈতন্য বাস্তবকে অস্বীকার করেননি কিন্তু একে অবলম্বন করেও অতিক্রম করতে চেয়েছেন। আমাদের বারে বারেই মনে হয় নীলাচলে ভক্তেরা এলে তিনি যে খুশী হতেন তার কারণ তিনি সন্ন্যাসী হয়েও মানবপ্রেমিক—সে মানুষ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। মা-কে তো বারবার স্মরণ করেছেন। সন্ন্যাসীর পূর্বজীবনকে চৈতন্য কি পুড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন?

কবীর মোটামুটিভাবে কাশীতে বেশি সময় কাটিয়েছিলেন। জোলার সন্তান কবীর আজীবন দারিদ্র্যেই কাটিয়েছেন। কিন্তু কাশীতে বাস করেও তিনি বিদ্রোহ করেছেন। চৈতন্যও বাস করেছেন নীলাচলে। এই দুই স্থানই তীর্থ। আর তীর্থ শুধু নয় দর্শন, ধর্মতত্ত্বালোচনার পীঠস্থান। সার্বভৌম বাস করেন নীলাচলে আর প্রকাশানন্দ কাশীতে। সর্বভৌম চৈতন্য-অনুগামী হয়েছিল। কবীর সেরকম কাউকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কবীর মৃত্যুর আগে কাশী ছেড়ে গোরখপুরের কাছে ছাপরা মঘরে চলে আসেন। চৈতন্য পুরীর রাজা থেকে নীলাচলের ধনীনির্ধনের সম্মান পেয়েছিলেন। নানক ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সময়ে পাঞ্জাবে কোনো প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের নাম পাই না। নানক নিজেই এবং তার পরবর্তী দশ গুরুরা পাঞ্জাবকে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে পরিণত করেছিলেন। এদিক থেকে নানকের

কৃতিত্বের কথা স্মরণীয়। কবীর নানক চৈতন্যের ধর্মজিজ্ঞাসার তুলনা করার একটি প্রবল বাধা হল কবীর নানকের মতো চৈতন্য কিছু রচনা করে যাননি। 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েক টুকরো লেখা চৈতন্যের রচনা মাত্র পাই। অথচ কবীর নানক প্রচুর না হোক তাঁদের ধর্মজিজ্ঞাসা, কর্তব্য, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজেরাই অনেক কিছু লিখে গেছেন। চৈতন্য বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শ এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর অনেক কিছু আলোচনাও হয়েছিল। 'জীবনসাথী'তে নানক সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাপার দেখতে পাই। কবীরের জীবনীতেও এইরকম বহুকথা এবং সংলাপাত্মক জিজ্ঞাসার উল্লেখ আছে। বিশেষজ্ঞরা সেগুলির উপর গুরুত্ব দেন না। কেননা সে সবে নানা কিংবদন্তী, অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনার সংযোগ আছে। অথচ চৈতন্যের ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং ভক্তজনের এসবই ভরসা। যতদূর বুঝি চৈতন্যকে আশ্রয় করে তাঁর ভক্তরাই চৈতন্য শিক্ষা রচনা করেছেন। সেক্ষেত্রেও খুবই সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। নবদ্বীপে এবং বিশেষ করে বৃন্দাবনে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল তার প্রেরণা নিশ্চয়ই চৈতন্য কিন্তু সিদ্ধান্ত সবটাই চৈতন্যের নয়। যাই হোক আমরা আগেই বলেছি চৈতন্য উদার মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী এবং কেশব ভারতীর অবদান চৈতন্যজীবনে গুরুতর। ভক্তিবাদের বীজও সেইখানে। কবীর নানক চৈতন্যের সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকে এবারে অন্যদিক থেকে দেখা যাক। আমরা একথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলতে পারি তখন সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে শাসকবর্গকে পাই। বাংলাদেশে তখন পাঠান সুলতানরা আছেন। ভারতে লোদী বংশ। আর পাঞ্জাবে লোদীদেরই শাসন, শাসনকর্তা দৌলৎখান। একথা ঠিক এই শাসকবর্গ হিন্দুদের সাহায্য ছাড়া রাজত্ব চালাতে পারতেন না। হিন্দুরা বিশেষত হিন্দু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা এই সব রাজাদের সভায় আনাগোনা করতেন। বাংলার রূপ-সনাতন, সুবুদ্ধি রায়ের কথা তো সকলেরই জানা। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা একদিকে জাতপাতের গণ্ডী টানলেন দৃঢ়ভাবে (যেমন, বাংলায় স্মার্ত রঘুনন্দন) অন্যদিকে শাসকের কাছেও নিরাপত্তা চাইলেন। তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীতে সাধারণ মানুষ—অন্ত্যজ শ্রেণী। সংখ্যায় এরাই বেশী। যেমন জমিদার, জায়গীরদারের অধীনে দেশে শান্তি বিরাজ করত, তারা ব্রাহ্মণ্য দাক্ষিণ্য এবং রাজানুকূল্য চাইতেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও অন্ত্যজ শ্রেণীর দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হয়নি। ব্রাহ্মণরা শাসকের কাছে মোশাহেব আর অন্ত্যজের কাছে রক্তচক্ষু। এরকম একটা দ্বন্দ্ব সমাজের মধ্যে ছিল যে দ্বন্দ্ব আপাতদৃষ্টিতে গোলাভরা ধান, বিশাল

বৃক্ষশোভিত দীঘি ইত্যাদির আড়ালে অনেকর সময় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। চৈতন্য এদেরই কাছে এলেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদের তুলে আনতে হবে। নবদ্বীপ পরিক্রমার সময়েই তিনি এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কবীর তো জোলার ঘরের সন্তান। রামানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে ঘরেও তিনি শান্তি পাননি। কাপড় বুনে বুনে এই জোলা বুঝতে পেরেছিলেন নির্যাতন কি বস্তু। অন্ত্যজ থাকার কি নিদারুণ যন্ত্রণা। আর নানক ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলমানে, 'জাতিতে' 'জাতিতে' কি দুস্তর ঈর্ষা, ঝগড়া, ঘৃণা। তিনিও নেমে এলেন এদের কাছে। চৈতন্য সৎ চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মর্যাদা দিলেন, মানুষের হীনমন্যতাকে দূর করলেন, আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নানক তো বললেন হিন্দু নয় মুসলমান নয় মানুষ মানুষই। কবীর বলছেন 'এক নিরঞ্জন অলহা সেরা হিন্দু তুরক দহূঁ নহী মেরা। / রাখুঁ ব্রত ন মহরম জাঁনাঁ তিসহী সুমিরূঁ জো রহে নিদাঁনাঁ॥' (আমার নিরঞ্জন আর আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরুক দুই নয়। আমি ব্রত রাখি না। মহরম কি তা জানিনা, নিদানকালে যে থাকে তাকে স্মরণ করি।) কবীর আরও বলেছেন 'পূজা করি না। নমাজ পড়ি না। হৃদয়ে এক নিরাকারকে নমস্কার করি।' কবীর নানক হিন্দুমুসলমানের গোঁড়ামির প্রতি কঠোর। চৈতন্য হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদের কথা খুব বেশি না বললেও এক যবন হরিদাসের প্রতি তাঁর মমতা, প্রীতি সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। যবন হরিদাসের জন্যে পুরীর মন্দিরের দ্বারে ভিক্ষা চাওয়া যে-কোনো সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত স্পর্শ করবে। নিজের আচরণের দ্বারাই চৈতন্য তাঁর অলিখিত বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর পুরী চৈতন্যের সেবার জন্যে শূদ্র গোবিন্দকে পাঠিয়েছিলেন। সার্বভৌম একটু বিস্মিত হয়ে চৈতন্যকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঈশ্বর পুরী শূদ্রকে কেমন করে রেখেছিলেন? চৈতন্য উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।' নীহাররঞ্জন রায় মসজিদ ও গুরুদ্বারের স্থাপত্যশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিছেন উভয়ের শিল্পরীতিতে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

আসলে চৈতন্যের সঙ্গে কবীর নানকের এখানে একটা পার্থক্য আছে। নানক তো মুসলমান ধর্মের সারকে যতটা পেরেছিলেন নিজধর্মে ততটা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলমানধর্মের আল্লা, খুদা, এ দুটি নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া কাদির, করিম, রহিম

সাহিব, পরবরদগর, শাহ, স্থলতান, খসম, দানা, বীণা—ব্রহ্ম বোঝাতে ওই নামগুলিও পাওয়া যায়। শিখধর্মে এইসব আরবী-ফার্সী মিলনের প্রয়াসে অনায়াসে স্থান দিয়েছেন। যেমন ব্রাহে গুরুজী-কী-ফতে এবং ব্রাহে গুরুজী-কী-খালসা। শিখধর্মের শব্দভাণ্ডারে আরবী-ফার্সী শব্দ অবিরল। খালসা (বিশুদ্ধ, শিখ ঈশ্বর), দরবার (গুরুর সভা), ফুরমাহু=ফর্মান (আদেশ, নির্দেশ), মসনদ (শিখ প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রদেয় দেবার জন্য সমাবেশ), দেওয়ান (উচ্চ কার্যালয়), শহীদ, তখত (সিংহাসন), বান্দা (ক্রীতদাস), মিসল (মিলন), বিহিশত এবং দোজখ (স্বর্গ-নরক), রব (প্রভু), হুকম (আদেশ)। অন্যদিকে যোগপন্থা থেকে নানক গ্রহণ করেছেন নিরঞ্জন, গোরখ, সতি-নাম, শবদ প্রভৃতি শব্দ। আবার ধ্যানের জন্যে তিনি অন্য শব্দও গ্রহণ করেন, যেমন, করতার, নিরনকার, পিয়ারা, প্রীতম, সচ, দীননাথ। কৃষ্ণ, গোপাল, মুরারি, গোবিন্দ, হরি তো পাওয়া যায়ই। এইসব শব্দাবলী ব্যবহার নানকের দূরদর্শিতা, মিলনাকাঙ্ক্ষাকে সূচিত করে। কবীরও রাম, রহিম, হরি, আল্লা, খসম, বান্দা, রহমান ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যের ধর্মে কৃষ্ণের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নাম ছাড়া অন্য নাম পাই না। চৈতন্য মুসলমান ধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিন্তু তাঁর বা তাঁর অনুগামীর চিন্তায় ওই জাতীয় মিলন প্রয়াস দেখতে পাই না। কবীর বিদ্রূপাত্মক ভাষায় হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামিকে ধিক্কার দিয়েছেন।

নানক ভিক্ষাবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়েছেন। সকলকে খেটে খেতে বলেছেন। চৈতন্য ভিক্ষার্জনকে ধিক্কার দেননি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিক্ষার মধ্যে মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন। তবে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রদর্শনীয় ব্যাপার করে তুলতে তিনি কখনই চাননি। নিজে হরিদাসের জন্য ভিক্ষা করেছেন। তাঁর অনুগামীরাও ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে রঘুনাথ দাস এবং ছোট হরিদাসের দৃষ্টান্ত মনে রাখলে ভিক্ষাবৃত্তির আদর্শটি বুঝতে পারা যাবে। রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেশ্যার আচার বলেছেন চৈতন্য। আর ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য। সুবুদ্ধি রায় তো মথুরা বৃন্দাবনে ভিক্ষাবৃত্তি করেন নি। কাঠ বেচে দিন চালাতেন। চৈতন্যের ভিক্ষাবৃত্তিতে আছে বৈষ্ণবের গৃহস্থের সঙ্গে যোগাযোগের দিকটি। বৈষ্ণবের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পথটি রুদ্ধ করলেন চৈতন্য। তাছাড়া কেউ নিমন্ত্রণ করলে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করাকেও চৈতন্য ভিক্ষাগ্রহণ বলতেন। ভিক্ষা কথাটি বৈষ্ণব বাতাবরণে ব্যাপক এবং গূঢ় তাৎপর্য নিয়েছিল। এই সূত্রেই নানকের গুরু কা লঙ্গর—কথাটি স্মরণ করি। নানক সকলের জন্যে এই লঙ্গরখানার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদ্বারে যিনিই

যাবেন তিনিই প্রসাদ পাবেন। চৈতন্যের মহোৎসব (হরিদাসের মৃত্যুকে স্মরণ করে) ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। খেতরীর মহোৎসবের কথা, নিত্যানন্দের চিঁড়াদধি উৎসবের সমারোহ, এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে আসে। কবীরের ধর্মকর্মে এইরকম কোনো মহোৎসবের সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে 'বাপ' ও 'মাঈ' সম্প্রদায় থেকে পরে ধনৌতি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দীক্ষাগ্রহণকালে প্রসাদভক্ষণ এবং ভোজের উল্লেখ আছে। গুরুদ্বার এবং বৈষ্ণব মন্দিরে এখনও ভোগবিতরণ একটা বড় ধর্মীয় বিধি।

নানক 'মূলমন্ত্র'তে বলেছেন।'

এক-ওঙ্কার, সতনম, করতা পুরখ
নিরভউ, নিরভৈর, অকাল মুরত,
অযুনি-সে-ভাঙ্গ গুরপ্রসাদ

এখানে লক্ষ্য করি উপনিষদেরই মর্ম। বাংলা করলে এর অর্থ ঈশ্বর এক, শাশ্বত সত্য তাঁর নাম, সবই তাঁর সৃষ্টি, কাউকে তিনি ভয় পান না কারও সঙ্গে অসদ্ভাবও তাঁর নেই, তাঁর মূর্তি অনন্তকালে প্রসারিত, তিনি জন্মাননি, তিনিই তাঁর সত্তা, গুরুর প্রসাদে মানুষ তাঁকে জানতে পারে। কবীরও বারবার রামই একমাত্র সত্য একথা বলেছেন (নামদেব, কবীর এবং নানকের পূর্ববর্তী আরও অনেকের বাণী গুরুগ্রন্থে পাওয়া যায়)। কবীরের একটি পদ এখানে উদ্ধার করছি :

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ-মুরত রাম-নিবাসী বাহর করে কো হেরা॥

*　　*　　*

জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্হারা।
কবীর পোঁগড়া অলহ-রামকা সো গুরু পীর হমারা॥

(যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার ? তীর্থমূর্তি সব রামের মধ্যেই আছে। বাইরে কে খুঁজে মরে। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা রামের ছেলে, তিনি আমার গুরু, তিনিই আমার পীর)। চৈতন্যের আরাধ্য কৃষ্ণ। তিনি কখনও কোনো 'মূলমন্ত্র' রচনা করেননি। রাধাভাবের আর্তি তার মধ্যে দেখেছি। সেই সময়ে তিনি 'নন্দতনুজ'-কে স্মরণ করেছেন এবং দিব্যোন্মাদে বলেছেন :

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শায় মর্মাহতাং করতু বা

যথা তথা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ।

কি অপরিসীম আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে এই শ্লোকে! সে কথা এখন থাক। চৈতন্যও এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' অথবা কৃষ্ণ 'সর্বকারণ কারণম্' এই তিনি জানতেন। কবীর নানক চৈতন্য বুঝেছিলেন হিন্দুর বহু দেবদেবীর আরাধনা অন্তত সেই সময়ে চলবে না। এক ঈশ্বর বলা মানেই মানুষও এক। বিভেদবুদ্ধির লোপ এই মনন-উপলব্ধিতে। জাতিভেদ লুপ্ত হতে পারে এই এক ঈশ্বরের ভাবনাতেই। রামমোহনও এই রকমই ভেবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই। কৌম ধর্ম কিভাবে জাতীয় ধর্মে এবং জাতীয় ধর্ম কিভাবে বিশ্বজনীন ধর্মে রূপান্তরিত হতে পারে তার গূঢ় ইতিহাস এখানে পেয়ে যাই আমরা।

আমরা জানি যোগীরা নাথপন্থীরা ভক্তিবাদীরা বারবার জপতপব্রত উপাসনাকে ধিক্কার দিয়েছেন। নামদেব-কবীর-নানক-চৈতন্য সকলেই এই কঠোর নিয়ম থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের নামমহিমা, নামকীর্তন, নাম জপ করতে বলেছেন। কেউ কেউ মহারাষ্ট্রের নামদেবের নাম কথাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, অর্থাৎ নামই ঈশ্বর। নামদেব বলেছেন একটি ছেলে ঘুড়ি তৈরী করে আকাশে উড়িয়ে দেয়। ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, ছেলেটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পও করে, খেলাধুলাও করে কিন্তু তার দৃষ্টি ঠিক ঘুড়ির দিকে থাকে। আমার চিত্তও রামনামের দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছে যেমন বিদীর্ণ হয় স্বর্ণকারের দ্বারা অলঙ্কার। নামদেব ত্রিলোচনকে বলছেন শিশু ঘরের বাইরে ও ভিতরে দোলনায় শুয়ে শুয়ে দোল খায়, তার মা নানা কর্মে ব্যস্ত কিন্তু মন পড়ে থাকে ঠিক শিশুর দিকে। কবীর বলেছেন 'নাম নিতে নিতে জিভে ফোসকা পড়ে গেল। বিরহের কমণ্ডলু হাতে আমার চোখ দুটি বৈরাগী হয়ে গেল। তারা চাইছে দর্শন-মাধুকরী, তা নিয়েই দিনরাত বিভোর হয়ে আছে।' এ তো চৈতন্যেরই কথা। 'নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদগদ রুদ্ধয়া গিরা। / পুলকৈর্নিচিতং বপু কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।' চৈতন্যের একমাত্র মন্ত্রই ছিল 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ'। নানক তো 'মূলমন্ত্রে'ই ঈশ্বরকে সৎনাম বলেছেন। নামদেব থেকে চৈতন্য সকলেই বুঝেছিলেন ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি শাসিত সমাজে দর্শনতর্ক নানা তর্কবিতর্ক মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। যার যেমন ইচ্ছা যখন খুশি নাম নিলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। একে এক জাতীয় বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। ওঙ্কারই হল মন্ত্র, রামই মন্ত্র, কৃষ্ণই মন্ত্র। অর্থাৎ এ সবই নাম, নামই ঈশ্বর। কবীর পাঁড়েদের (পণ্ডিতদের) ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন।

মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের বড় কীর্তি ভাষাব্যবহারে ও ভাষানির্মাণে। প্রায় সকল নবধর্মই আঞ্চলিকভাষাকে তাঁদের ধর্মপ্রচারে গ্রহণ করেছেন। কবীর, নানক, চৈতন্য যে সময়ে এসেছিলেন সে সময়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তখনও সংস্কৃতের প্রতি টান যায়নি। আমাদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত। উচ্চকোটি সমাজের মানুষের সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার প্রতি সংশয়। কিন্তু কবীর নানক কেউই সংস্কৃতকে গ্রহণ করেন নি। কবীরের ভাষাকে সাধারণভাবে হিন্দী বলা যায়। কিন্তু কবীর বলেছেন 'মেরী বোলী পূরবী'। পণ্ডিতেরা পুরবী ভাষার সঙ্গেও এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পান না। যাই হোক ভাষাবিজ্ঞানের জটিলতায় না গিয়েও বলা যায় কবীর নবজাত ভাষাকেই গ্রহণ করলেন। এই ভাষাই সাধারণের ভাষা। আমরা যে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের কথা বলেছিলাম এই ভাষাতেই তারা কথা বলেন, এই ভাষাতেই তাদের ভাববিনিময়। নানকও যে ভাষা নিলেন তাকে বলা যেতে পারে পাঞ্জাবী ভাষার প্রাথমিক রূপ। চৈতন্যও বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বাংলা গান তো তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। চৈতন্য যাত্রা করতেন। গান এবং যাত্রা ছিল বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের অন্যতম বাহন। আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করে তিনজনেই নবজাত ভাষার গতিকে তীব্রতা দিয়েছিলেন।

নানক কবীরের ভজন এবং দোহায় যেসব উপমা গ্রহণ করা হয়েছে তাও লোক অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। নানকের বরা মাহ (বারোমাস্যা) তো একেবারে লোকগীত থেকে উঠে এসেছে। কবীরের দোহায় পাই 'সাহেব হৈ রঙ্গরেজ চুনরী মেরী রং ডাবী' এখানে সাহেব অর্থাৎ ঈশ্বরকে বলা হচ্ছে রঙ্গরেজ আর চুনরী (বুঁটিদার ওড়না) হচ্ছে ভক্তের ওড়না। 'চুবিয়া', 'তুলহিন' এসব তো পরিচিত শব্দ। কিংবা কবীর যখন বলেন 'ওরে বান্দা, আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস্। আমি তো তোর পাশেই রয়েছি। আমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই, কাবাতে নেই, কৈলাসে নেই, কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব স্বাশোঁকী স্বাসমেঁ॥' এই রকম সাদামাটা অথচ অব্যর্থ ভাষায় কবীর তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

চৈতন্যের আস্বাদিত বৈষ্ণব পদে লৌকিকভাবনা নেই এমন কথা বলি না। কিন্তু সে ভাষা শিল্পের ভাষা। মনে রাখতে হবে চৈতন্য যা শুনতেন তা স্বরূপ-দামোদর পরীক্ষা করতেন। আরো একটি বিষয়ে চৈতন্য ভাষার ক্ষেত্রে কবীর নানক থেকে আলাদা হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ দুঃখ করে বলেছেন নানকের ভজন আঞ্চলিক ভাষায় ছিল বলে গুরুবাণী সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েনি। চৈতন্য বৃন্দাবনে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন

তাঁরা কিন্তু সংস্কৃতভাষাকেই আশ্রয় করেছিলেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে কিছুটা বিস্তৃত হয়েছিল এইভাবে। এর ফল একদিক থেকে নিশ্চয়ই ব্যাপক হয়েছিল অন্যদিকে বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শন খানিকটা সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আসলে চৈতন্যের ধর্মে ভারতীয় সনাতন ধর্মের অঙ্গীকার কবীর নানকের ধর্মের চাইতে বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দে রাধামোহন ঠাকুর যখন বৈষ্ণবপদের সমস্ত টীকা করেন তখন আমরা উল্লসিত এই ভেবে যে বাংলার মর্যাদা এতই যে তার টীকাভাষ্য রচিত হচ্ছে দেবভাষা সংস্কৃতে। কিন্তু এখন আমাদের মনে হয় এই উল্লাসের কোনো কারণ নেই। বিপরীত দিক থেকে বৈষ্ণব পদ যে উচ্চকোটির তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে উঠছে তারই নিদর্শন এটি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলাতেই লিখেছেন চৈতন্যজীবনী কিন্তু সংস্কৃত শ্লোককে যথাযোগ্য মান্য করেছেন। (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় বৃন্দাবনের চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথিগুলি বিচার করে দেখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন সংস্কৃত শ্লোক কোনো পুঁথির সঙ্গে কোনো পুঁথির মিল নেই। তাঁর সন্দেহ কৃষ্ণদাস হয়ত সংস্কৃত শ্লোকগুলি ব্যবহারই করেন নি)। অথরিটি কোট করা ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও রূপ-সনাতন জীবের প্রতি আনুগত্য তো কৃষ্ণদাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে। পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন সিং যখন আদি গ্রন্থ সাহেব সংকলন করেন তিনি কিন্তু ভারতের লোকমুখী সাধকদের পদই সংগ্রহ করেছেন। সংস্কৃত বাণী তিনি নেননি।

কবীর কোনো সম্প্রদায় গড়তে চাননি। চৈতন্য সম্প্রদায়ের কথা বলেন নি। নানক এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি শিখ (শিষ্য) সম্প্রদায় গড়লেন। কবীর চৈতন্য না চাইলেও পরবর্তীকালে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। নানকের পর আমরা আরও নয়জন গুরুকে পাই। দশম গুরু গোবিন্দ সিং নির্দেশ দিলেন এরপর থেকে গ্রন্থই গুরুর স্থান দেবে। এই দশজন গুরু ধর্মপ্রচার করেছেন নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। এমন কি রাষ্ট্রও অনুকূল ছিল না শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি। শিখরাও দুর্জয় সাহসে মুসলমান শাসকের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য না চাইলেও গোড়ায় নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থিতি আমাদের মানতেই হবে। খেতরীর মহোৎসবে বৃন্দাবনের প্রাধান্য মেনে নেওয়া হয়েছিল। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ তখন নেই। বৈষ্ণবধর্মে ধর্মীয় বিধিবিধানের পরিসর প্রশস্ত হল। কবীরের সম্প্রদায়ের উল্লেখ ও এখানে করতে হয়। প্রাচীনতর 'বাপ' শাখায় একুশ জন গুরুর নাম পাওয়া যায়। কাশীতে কবীর চৌরার প্রধান মঠটি বৃহত্তর। 'মাঈ' শাখার প্রতিষ্ঠাতা ধরমদাস। এই শাখায় গুরুপদ বংশগত। অন্তত চোদ্দ জন গুরুর নাম

পাই এই শাখায়। এরই অন্য একটি শাখায় আরো নয়জন গুরুর নাম পাই। মাঝ শাখা ছত্তিশগড়ী শাখা। স্পষ্টত কবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত পাতের ভেদ দেখা দিতে আরম্ভ করে। নানকের পর যে গুরুদের আমরা পাই তাদের নির্দেশ সমস্ত শিষ্যদের শিরোধার্য ছিল। কিন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গোড়ায় কাটোয়া, খেতরী ইত্যাদি উৎসবে ঐক্য সংস্থাপিত হলেও বিভিন্ন বৈষ্ণব পাটের একের সঙ্গে অপরের যোগ খুব দৃঢ় ছিল না। একজন গুরুর অধীনে গোটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মিলিতও হতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে আমাদের মেনে নিতে হয়।

কবীর নানক চৈতন্য সম্পর্কে নানা অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ঘটনার কথা কবীর জীবনী, জীবন সাথী এবং চৈতন্য জীবন গ্রন্থগুলিতে পাই। এসব কথা যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক মেনে নেবেন না। নানকের আধুনিক জীবনীকার Mcleod প্রত্যেকটি অলৌকিক ঘটনার বিচার করেছেন। অধিকাংশ ঘটনাকেই তিনি ভিত্তিহীন বলেছেন। যেমন নানক পর্বতচূড়া থেকে নিক্ষিপ্ত বিশাল শিলাখণ্ডকে আঙুলের দ্বারা থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ সৃষ্টি হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু Mcleod প্রত্যেকটি ঘটনা সৃষ্ট হবার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। এবং তার শাঁসটুকু যেখানে পেয়েছেন সেখানে সেই সত্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নীলাচলে চৈতন্য দূষিত কুয়োর জলে মন্দাকিনী ধারাকে নিয়ে এসেছিলেন এ ঘটনাও অলৌকিক কিন্তু ঘটনার শাঁস বোধ হয় এই কথা বলে যে ভক্তের জন্য চৈতন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কবীরের মৃত্যুর অলৌকিক ঘটনার কথাই ধরা যাক। আমরা জানি কবীর ভক্তদের বাইরে থাকতে বলে নিজে দরজা বন্ধ করে মৃত্যুতে ঢলে পড়লেন। বাইরে তাঁর হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা অধীর অপেক্ষায়। দরজা খুলতে দেখা গেল, 'কোথাও দেহ নেই। আছে দুখানা চাদর আলাদা করে বিছান আর প্রত্যেক চাদরের উপর একরাশ পদ্মফুল।' এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার আবশ্যকতা নেই। অলৌকিক রহস্যের মধ্যেও 'একটি বিরাট হিয়া'র মৈত্রীর বাণী শুনতে পাওয়া যায়।

কবীরের বাণীতে যোগপন্থার প্রতি বিরূপতা থাকলেও কবীর নাথ যোগীদের ঐতিহ্য বেশ কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন। Mcleod দেখিয়েছেন নানকের ধর্মেও নাথযোগীদের পথ অনুসৃত। যদিও কবীরের মত নয়। এমন কি কিছু পারিভাষিক শব্দও পাওয়া যায় যেগুলিকে নানক শাস্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েছেন। চৈতন্যের কথায় বা আচরণে আমরা যোগপন্থার অঙ্গীকার আছে বলে মনে করিনা। তবে সহজিয়া

ধর্মের সূত্রে (যার মধ্যে যোগপন্থা গৃহীত) চৈতন্যধর্মেও যোগসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের হেরুক-নৈরাত্মা মিথুন বৈষ্ণবধর্মের রাধা-কৃষ্ণ রূপে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। এই তিন জনেই সহজ পথের পথিক—কবীর নানক চৈতন্য। কবীর নানক দুজনেই পরম কে প্রেমিক রূপে কল্পনা করেছেন। নানকের 'বারহ মাহ'র কীর্তনগুলিতে আমরা বিরহিনী প্রেমিকার আর্তিকেই পাই। কবীর বলেছেন 'প্রিয়তমের বিরহে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। আমার দিনে শান্তি নেই, রাতে নেই ঘুম।' অথবা 'পিয়া মেরা জাগে মৈঁ কৈসে সোঈ রী' (প্রিয় আমার জেগে রয়েছেন। আমি কি করে ঘুমিয়ে পড়লাম)। এইসব দোহা-পদ তো বৈষ্ণব সাধনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চৈতন্যধর্মে ভাগবতকে সর্বপ্রমাণের প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে (আগে বলেছি চৈতন্যের ধর্মে সনাতনী ভারতীয় ধর্মের স্বীকৃতি)। চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ তো একই ভাবের প্রকাশক। ঈশ্বর চিন্তায় নানক 'শবদে'র উপর জোর দিয়েছিলেন। ধ্যানের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন আর নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্য এরই যেন বিগ্রহ। কিন্তু কবীর নানক দিব্যোন্মাদে বিভোর হননি। কবীর নানক অবতারবাদেও বিশ্বাস করতেন না। নানক সম্বন্ধে Mcleod বলেছেন In the works of Guru Nanak asceticism is explicitly rejected and its place a disciplihed worldiness is set forth as the proper path for the believer. A penessary hort of this disciplined worldiness was the insistence that the believer should live on what he had himself laboured to receive. (Guru Nanak and the Sikh Religion, p 231)। Mcleod এই বলে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন combination of piety and practical activity ই ছিল নানকের ধর্মের মূল কথা। কবীর চৈতন্যের ধর্মে piety নিশ্চয়ই আছে কিন্তু pratical activity'র প্রতি তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা এখানে পরবর্তী কালের গোস্বামীদের চিন্তাভাবনার আলোচনা করছি না। অথবা নবদ্বীপের মহান্ত গুরুদের প্রসঙ্গকেও স্মরণ করছি না। চৈতন্য গৌড়ীয় ভক্তদের সংসার ধর্ম করতে বলেছিলেন এই পর্যন্ত জানি। কিন্তু যে মানুষটি চিত্তে অগস্ত্যতৃষ্ণা নিয়ে তৃষ্ণাহর সমুদ্রের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন তাঁর সেই চিত্রটিই আমাদের মুগ্ধ করে।

চৈতন্যধর্মের উত্তরাধিকার

পল্লব সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন তাঁর 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' গ্রন্থের ৫১ এবং ৫২, এই দুটি পাতা জুড়ে মোট একশ-একটি সাধক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা মোটামুটিভাবে চৈতন্যোত্তর বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মূল বৃত্তের বলয়ভুক্ত বলে গণ্য না হলেও, সাধন এবং ভাবনে বৈষ্ণবীয় প্রেরণাতেই প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রদেশে [এবং অন্যত্রও] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম—যা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তার সঙ্গে নানানভাবে আধ্যাত্মিক, সাধনতাত্ত্বিক এবং প্রাকরণিক ক্ষেত্রে এই শাখার প্রভেদ যা-আর-যতটাই থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে এদের রূপ-পরিচিতিটুকু যদি না গ্রহণ করা হয়, তাহলে চৈতন্য-ধর্মেরও পূর্ণায়ত মূল্যায়ন করা অসম্ভব হবে। ধর্মসাধনাকে অবলম্বন করে বাংলার জনজীবনে যে ভাবনার প্রবহমানতা শ্রীচৈতন্যের প্রয়াণের পরের কয়েক শতাব্দীতে উৎসারিত হয়েছিল, তার জোয়ার-ভাটা অনেকখানিই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এইসব ছোট ছোট বৈষ্ণবীয়-ধর্মগোষ্ঠীর দ্বারা, একথাটুকু প্রথমেই স্মরণযোগ্য।

গোস্বামী মশাইয়ের বইতে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে—তার প্রথম নামটি অবশ্য সর্বজন-পরিচিত : বাউল। এটি ছাড়া বাকি একশটি সম্প্রদায়ের নাম এখানে প্রাসঙ্গিক বোধে উল্লেখ করা গেল :

ন্যাড়া, দরবেশ, সাঞি, আউল, সাধ্বিনীপন্থী, সহজিয়া, খুশিবিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রামসাধনীয়া, জগবন্ধু-ভজনীয়া, দাদুপন্থী, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, মীরাবাঈ, বিথলভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক / রূপ কবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বড়ি, অতি বড়ি, রাধাবল্লভী,

সখিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশচন্দ্রী, সন্নপন্থী / মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেন্বী, মটুকধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়কা ভাট, মহাপুরুষীয় ধর্মসম্প্রদায়ী, জগমোহিনী, হরিবোলা, রাতভিখারী, উৎকলী, বিন্দুধারী, অনন্তকুলী, সংকুলী, যোগী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, ফারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদ দাসী, অহমদপন্থী, বীজমার্গী, অবধূতী, তিঙ্গল, মানভাবী, কিশোরী ভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া / নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী, শাণ্ডমী, নরেশপন্থী, দশামার্গী, পাঙ্গুল, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী, কুম্ভপাতিয়া খোজা, গৌরবাদী, বামে কৌপীনে, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীন ছাড়া, চূড়াধারী, কবীরপন্থী, খাকী এবং মুলুকদাসী।

স্বভাবতই একটি নিবন্ধের মাধ্যমে এঁদের সবায়ের সম্পর্কে নিবিড় অন্বেষণ করার অবকাশ বা প্রয়োজন নেই [এবং তা করবার যোগ্যতাও নেই এই দীন লেখকের]; তা ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সীমান্তস্পর্শী হলেও এদের অনেকের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য এবং বৌদ্ধ, এমন কি সূফীবাদের সরণি ধরে মুসলিম ধর্মেরও প্রতিভাস পড়েছে। আরও পরবর্তীকালের খৃস্টধর্মের ভাবাগত রীতি-পদ্ধতিও এদের দুয়েকটির মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হয়েছে। কোনো-কোনোটি আবার বাংলার সাংস্কৃতিক বলয়ের বাইরে সঞ্জাত এবং / কিংবা বিকশিত হয়েছে, যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিবেশী এইসব শাখা-ধর্মমতগুলির বৃহৎ পরিবারের বাইরেও তারা নয়। সব মিলিয়ে সমস্ত বুননটা অত্যন্ত জটিল এবং নানা বিপ্রতীপ আকর্ষণে-বিকর্ষণে বহুলাংশে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে।

তবু সমস্তটুকু মিলিয়ে এদের মধ্যে অনেকটাই সমধর্মিতা আছে, যার সূত্রে এই ধর্মধারা বা কাল্টগুলি চৈতন্যধর্মকে কিভাবে কতটা বিকশিত করতে পেরেছে বা হতে দিয়েছে, সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বটিকে খুঁজে-পেতে বার করা একেবারে অসাধ্য নয়। বৃহৎ যে তালিকাটি ওপরে সংকলিত হয়েছে তার থেকে, প্রত্যক্ষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে যে শাখাগুলি সম্পর্কিত নয়—সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে ফেলা প্রয়োজন আলোচনার সুবিধার জন্যেই। উত্তর-চৈতন্যকালের বৈষ্ণবভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মহাপুরুষীয়রা আসামে, বিন্দুধারী, বড়ী, অতিবড়ী ওড়িশায়, কবিরাজী, সৎকুলী, অনন্ত-কুলীরাও তাই, বিরকত, অভ্যাহত, নিহঙ্গ, কালিন্দী, চামার—এঁরাও উৎকল অঞ্চলেই মূলত কেন্দ্রীভূত ছিলেন। চরণদাসীরা দিল্লী এলাকায়, মার্গীরা দ্বারকায়, পল্টুদাসী,

সৎনামী ও আপাপন্থীরা অযোধ্যা, কাশী, লক্ষ্ণৌ এবং নেপালে, বীজমার্গীরা মূলত গির্ণারে, স্বামীনারায়ণীরা আমেদাবাদে ও জামনগরে, হরিশচন্দ্রী, সধ্নপন্থী ও মাধবীরা প্রধানত পশ্চিম ভারতে, চুহড়পন্থী ও কুড়াপন্থীরা আগ্রা মুলুকে আর হরিব্যাসী, রাম-প্রসাদী, বড়গল, লস্করী এবং চতুর্ভুজীরা মোটামুটিভাবে হিন্দীভাষী বলয়ের নানা অঞ্চলেই বিকাশ লাভ করেন। নবদ্বীপবাবুর সংকলিত গোষ্ঠী তালিকা ছাড়াও, আরো যে-কটি নাম এখানে উল্লিখিত হল, সেগুলির উৎস অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি, প্রাসঙ্গিক ভাবে সেকথা এখানে উল্লেখনীয়।

॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নদীয়াকে কেন্দ্র করে এইসব বহুবিচিত্র ধর্মশাখাগুলির মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছিল কালক্রমে মোট পাঁচটি গোষ্ঠী : ছেঁউরিয়ার লালনশাহী, মেহেরপুরের বলরামী, ভাগার খুশিবিশ্বাসী, বৃত্তিহুদা-দোগাছিয়ার সাহেবধনী এবং ঘোষপাড়ার কর্তাভজা। যে-প্রথম পুরুষরা এই ধর্মধারাগুলির প্রবর্তন করেছিলেন, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর বলয়ভুক্তদের কাছে অনেকেই শ্রীচৈতন্যের অবতার রূপে গণ্য হতেন। এই পঞ্চক ছাড়াও ক্ষুদ্রতর অন্য যে-সব সম্প্রদায় ১৭শ-১৮শ শতকে গড়ে উঠেছিল, এই ব্যাপারটি তাদেরও অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

সামগ্রিকভাবে, প্রধান এই পঞ্চগোষ্ঠী [এবং অন্যান্য অপ্রধান সম্প্রদায়গুলিও] ঐতিহ্যবাহী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে সমান্তরাল প্রবাহে বাংলাদেশের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে যে ভিন্নতর প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল, কয়েকটি পৃথক নিরিখে তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, চৈতন্যের সমকালে এবং পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরে মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে প্রবল সামাজিক আলোড়ন তুলেছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেটি স্তিমিত হয়ে যায়। সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও সমদর্শিতার আদর্শগুলি তাত্ত্বিকভাবে বজায় থাকলেও, ব্যবহারিক ইতিহাসে যে-বেদনাদায়ক ঘটনা বারংবার ঘটেছে ধর্মসংঘের ক্রমবিবর্তনের সূত্রে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কালক্রমে বৈষ্ণবধর্মের মূল শাখাটিও এক-অর্থে সাম্প্রদায়িকভাবে সীমাবদ্ধ একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে, ভেদবুদ্ধিহীনতা; "আচণ্ডালে কোল"-দেওয়া; বৈষ্ণবীয় আদর্শানুগ "কীর্তনীয়া সদা হরি" প্রচলিত থাকলেও, তার অচির-পূর্ববর্তী ছত্রের নির্দেশ "অমানিনা মান দেন" ইত্যাদি ব্যাপার ক্রমে-ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল।

এর ফলকথা দাঁড়াল এই যে, যে ভেদবুদ্ধি এবং সংকীর্ণতার চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মীয়-তথা-সামাজিক আন্দোলন আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, ;তী সময়ে সেই ধর্মধারার উত্তরাধিকারের বড় তরফ বলে যাঁরা গণ্য হলেন, তাঁরা জরাই আবার নূতনতর ভেদবুদ্ধির দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বস্তুতপক্ষে, শ্রীচৈতন্য-র্তিত মানবতাবাদী প্রেমধর্মের চেতনাটাই মূল বৈষ্ণবীয় আন্দোলন থেকে 'ত হয়ে গেল—একথা রূঢ় হলেও সত্য যে, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। আর হিন্দু ধর্মধারাও যেমন স্বকেন্দ্রিক এবং অন্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল মধ্যযুগের শেষ য়ে, চরিত্রগতভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মধারাকেও তার থেকে ভিন্নতর কিছু বলে আর করার উপায় থাকল না।

ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা অবশ্য জানেন যে, এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নয়। জের বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এক প্রগতিশীল শক্তির অন্তর্লীন অবক্ষয় ঘটে এবং াক্রমে সেই একদা প্রগতিশীলতার সামাজিক শক্তির উত্তরাধিকারীরাই পুরোপুরি তক্রিয়াশীল বলে গণ্য যদি না-ও হয়—অন্তত রক্ষণশীলতার প্রতিভূ রূপেই প্রতিপন্ন যায়।·· ধরুন না কেন, ক্রীশ্চান চার্চের কথাই। কুড়ি শতাব্দী আগে নাজারেথের দ্র ইহুদীর সন্তান জোসুয়া, মহামানব জীসাস ক্রাইস্টে পরিণত হয়েছিলেন। রোম াজ্যের পীড়নে নিষ্পিষ্ট ইজরাইল, ফিলিস্তিন, গ্যালিলির লক্ষ-লক্ষ দরিদ্র ইহুদী পালক এবং কৃষিজীবী মানুষগুলির বেদনার ক্রুশ কাঠ বহন করে। তাঁর উদ্দীপনাময় বির্ভাব, অসহায় মানুষগুলির প্রতি সুগভীর মমতা এবং সমবেদনা—তাদেরকে াবিত করে তুলেছিল শাসকগোষ্ঠীর পীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ তে—অস্ত্রবলের দ্বারা নয়, নিছক মনোবলের জোরে। খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এইভাবেই ছে—মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ মিলেছে তার মাধ্যমে। সে মুক্তি কতখানি াত্ত্বিক, সেই কথা বিচারের অধিকার এই অপটু আলোচকের নেই; কিন্তু সে-যে াজিক শৃঙ্খলমুক্তির আলোকদিশা হিসেবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল, একথা তো নিশ্চিন্ত ই বলতে পারি। কী উৎপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল জীসাস প্রবর্তিত পন্থায় পদক্ষেপ করে তার ঐতিহাসিক খতিয়ান াবে উৎসাহী পাঠক যদি গিবনের 'দ্য ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার' ট মন দিয়ে পড়েন। বহু বিখ্যাত 'কুয়ো ভাদিস' বা 'বেনহুর' কিংবা পার লাগেরক-ট-এর 'বারাব্বাস', কি রবার্ট গ্রেভসের 'আই, ক্লডিয়াস' উপন্যাস, কি কীট্সের 'দ্য সেণ্ট অ্যাগ্নেস' কবিতার কথাও যদি মনে করেন, তাহলে এই মুহূর্তেই রোমান

শাসকদের মানবতাবিরোধী পীড়ন-শোষণের স্বরূপ এবং তার বিরুদ্ধে আত্মবলে বলী
নৈতিক প্রতিরোধ-সঞ্জাত খৃস্টধর্মের অভ্যুদয়ের পটভূমিটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চো
সামনে।

কিন্তু কালক্রমে কি দেখা গেল? রোম সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে যখন খৃস্টধর্ম র
শক্তির উপাস্যে পরিণত হল, তার কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের বুকে মধ্যযু
সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকার ঘনিয়ে এসে নূতন এক শোষক-ও-পীড়ক শক্তির কঠিন অভ্যু
ঘটল; আর তার সবচেয়ে বড় সহায় হয়ে দাঁড়াল ঐ চার্চগুলিই! ডাইনী
ইনকুইজিশন করা, জ্যান্ত কোনো মানুষকে পুড়িয়ে মারা (জোয়ান আর্কের কাহি
অবশ্যই মনে পড়ছে), জ্ঞানবিজ্ঞানের-শিল্পসাহিত্যের যুক্তিবাদী দর্শনভাবনার সমস্ত
চর্চাকে নিষিদ্ধ করা, মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অস্বীকার করে তাকে
পশুর মতো ভূমিদাসে পরিণত করা ইত্যাদি ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র এবং গীর্জাতন্ত্র সহো
ভাইয়ের মতো যেন অচ্ছেদ্য নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। মার্টিন লু
জার্মানীতে সর্বপ্রথম, তার পর ইংলণ্ডে ওয়াইক্লিফ, চেকোশ্লোভিয়ায় জন হাস প্র
তাই নূতন করে আবার পোপ-শাসিত এবং সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষিত খৃষ্টীয় ধর্মসং
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

এত ব্যাপকভাবে না হলেও কমে-বেশিতে এটা সমস্ত ধর্মেই ঘটেছে: অত
চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মধারাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভিন্ন ধর্মধারাবলম্বীদের 'পা
হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি যে-সব ব্যাপার বহুজন-পরিজ্ঞাত, সে-সব কথাই এখ
প্রাসঙ্গিক। খৃষ্টীয় চার্চের মতো রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের শোষণের প্রত্যক্ষ শরিক মহা
সর্বক্ষেত্রে হননি ঠিকই, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তির পোশাকে জমিদ
চালানোটাও বিশেষ অপরিচিত নয়। চৈতন্যদেব সর্বমানবের শোষণমুক্তির প্রেক্ষি
যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীকালে তার তাত্ত্বিক অস্তিত্বটুকু ব্যবহা
প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখীই হয়ে গেল হয়ত বা।

॥ ৩ ॥

'কমনম্যান'স রিলিজিওন' বলতে যা বোঝায়, সেই পদবী থেকে মহান্ত-মঠ ইত্যা
কেন্দ্রিত বাংলার বৈষ্ণবীয় ধর্ম যখন বিচ্যুত হয়ে পড়ল, তখন সেই শূন্যস্থান অচিরকা
মধ্যেই পূরণ করে ফেলল শাখা ধর্মগুলি, যাদের উল্লেখ এ নিবন্ধের গোড়ায়
করেছি

এখানে, এদেশের ইতিহাসের জটিল একটি তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে অচির-পূর্বের ব্যটির পরিপ্রেক্ষণে। ভারতীয় দর্শনের 'বিলুপ্ত'-বলে-কথিত দশম শাখাটি—অর্থাৎ কায়ত মত—প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এদেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে নির্মূলিত হয়ে যায় । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জের নিচের দিকের সিঁড়ির মানুষদের জীবনে কেমনভাবে লোকায়ত মতের বাস্তব চব্যক্রিয়া ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সবার অলক্ষ্যে, সেটি দেখিয়েছেন। এই হন্ন লোকায়তিকতার উত্তরসরণ করেই এককালে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল। র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় যখন ঘটল আচার্য শঙ্কর প্রমুখের জেহাদী নিবন্ধে, তখন ণতি ঘটল বৌদ্ধধর্মেরও; নানা 'যানে' বিভক্ত হয়ে তখন সে ধর্মের মানবপ্রেমটুকু ন হল ধীরেধীরেই। লোকায়ত ধর্মধারা তখন লৌকিক পূজা-পার্বণ-ব্রত-তিথিপালনের বেশে আবার প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সূফী ধর্মধারা বা কালটের সাহচর্যে যখন এল, তখন উভয় ধারার । ও রূপগত বহুবিচিত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্যের সূত্রে ধীরে ধীরে বাউল ধর্ম গড়ে উঠেছিল বত ১৭শ শতকের মধ্যকাল থেকেই। প্রেমধর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরানুসন্ধান এবং সর্ব-বের মধ্যে সেই প্রেমানুভব লাভ করার প্রয়াস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং সূফীধর্ম—রই মূলকথা। 'যবন' হরিদাস প্রমুখ 'বিধর্মী'-কেও আত্মার আত্মীয় হিসেবে গণ্য র শ্রীচৈতন্য যে সমন্বয়বোধ সৃষ্টি করেছিলেন গৌড়বঙ্গের সামাজিক পরিমণ্ডলে—কই ভিত্তিতে রেখে ধীরে ধীরে বাউল এবং অন্যান্য লোকায়ত ও সমন্বয়মুখিন ধর্ম শিত হয়ে উঠল। এই সব 'অব্‌স্কিওর রিলিজিয়াস কাল্ট্‌'-গুলি নানা বিচিত্ররূপে যে বিকাশ লাভ করতে লাগল, সেই বিবর্তনের যাত্রাপথে এসে প্রাচীন লোকায়ত তিগুলির প্রচ্ছন্ন নানা উপাদান এসে সামিল হয়ে গেল।

এই সমস্ত ব্যাপারটিই আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের ফল। পরপৃষ্ঠার ছকটির মাধ্যমে বক্তব্যটুকু স্পষ্ট করার চেষ্টা করি :
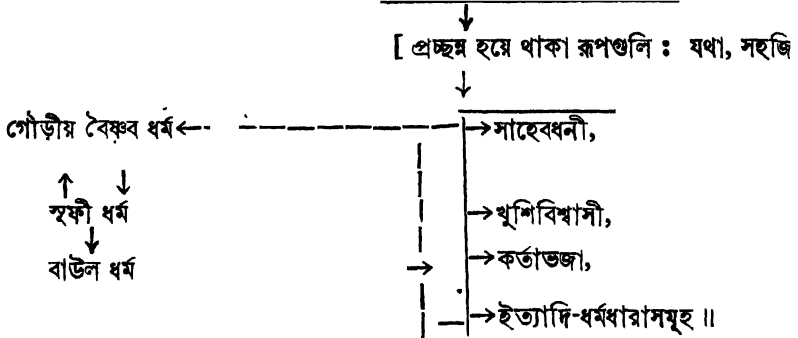
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম কালক্রমে যখন প্রাতিষ্ঠানিক তথা আয়তনিক চরিত্র ত করল, তখন বৈষ্ণবীয় ভাবধারার লোকজীবনকেন্দ্রিত উপাদানগুলি এসে সঞ্চিত হল মাটির কাছাকাছি থাকা শাখা-ধর্মধারাগুলির মধ্যে। হিন্দুতে-মুসলমানে, তথাকা উচ্চ বর্ণে-নিম্ন বর্ণে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এইসব 'অ-কুলীন' বৈষ্ণবীয় কাল্‌টগু মাধ্যমে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত প্রেম-মৈত্রী-সাম্যপ্রবণ মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রা চরিত্রটি আপাত রূপান্তরিতভাবে হলেও, অস্তিত্বটুকু বজায় রাখল কিন্তু, য সঙ্গোপনেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যখন লোকায়ত চরিত্রটি হারিয়ে ফেলে মঠ মোহস্তকেন্দ্রিক যুগীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই লোকায় চরিত্র বজায় রাখার উত্তরাধিকার বর্তাল এই সব ছোট-ছোট ধর্মধারাগুলির উপ এদের যথার্থ রূপটি উদ্ভাসিত করতে হলে তাই প্রয়োজন হবে অন্তত এই তিনটি বিষ তথ্য-তত্ত্বকেন্দ্রিক অন্বেষণ :

ক. এই ধর্মধারাগুলি কতখানি শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত লৌকিক ঐতিহ্যের প্র অনুসারী বলে নিজেদেরকে গণ্য করেছে?

খ. সামাজিক সমন্বয় এবং দ্বন্দ্ব এদের মধ্যে কেমনভাবে আর কতখ প্রতিফলিত হয়েছে? এবং,

গ. লোকায়ত-মতের উপাদান বস্তুতই কতখানি এদের মধ্যে সমা হয়েছে?

এ-তিনটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষাতেই আলোচনা করি অতঃপর।

চৈতন্যদেব তাঁর জীবনকালেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের উৎসস্থল সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নবদ্বীপ থেকে পুরীতে। নদীয়ার লোকধর্ম পুরীতে প্রবাসী হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের আনুকূল্যে রাজধর্মের চারিত্রিক উপকরণ সঞ্চয় করল এবং জগন্নাথের মন্দিরের মোহন্তদের অপ্রচ্ছন্ন বিরূপতার প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে তার মধ্যেও একটি প্রতিস্পর্ধী মোহন্ত-নির্ভর চরিত্র গড়ে উঠল। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর উত্তরভারত-পূর্বভারতের বৈষ্ণব আন্দোলন সংহত হতে থাকে বৃন্দাবনধামকে কেন্দ্র করে; মূলতঃ ষড়্‌গোস্বামীর দর্শনবীক্ষণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে চৈতন্যজীবনবৃত্ত বিশ্লেষণ ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে ধ্রুবপদী বা ক্লাসিক্যাল মহিমায় মণ্ডিত করে তুলল। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক সংশ্রব, মোহন্তপ্রাধান্য এবং পরিশীলিত দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি—এই তিন কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তার জনজীবনস্পন্দনকারী রূপটি হারাল এক সময়ে।

এ-ধর্মের জন্মভূমি নদীয়াতে কিন্তু সেই স্পন্দনশীল অস্তিত্বটুকু অব্যাহত ছিলই। নবদ্বীপ-মায়াপুর-কেন্দ্রিত ধ্রুবপদী-বৈষ্ণব 'হেড কোয়ার্টার' অবশ্য স্ব-মহিমায় ফিরে এসেছিল অবশেষে। কিন্তু পরিবর্তিত চরিত্রে আবির্ভূত হয়ে সে-ধর্ম তার আত্মজ (নাকি, নিকটজ্ঞাতিস্বরূপ?) লৌকিক শাখাধর্মগুলিকে সুনজরে দেখতে পারে নি।

"যত ছিল ন্যাড়াবুনে,
সব হল কীর্ত্তুনে।"

—এই প্রবাদের আবির্ভাব, সেই ধর্মধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাসকেই সূচিত করে যে-সব প্রমাণ, তার অন্যতম বলে গণ্য হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতিতে যে আদিপুরুষেরা এ-সব শাখা ধর্মের উৎসে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই তাঁদের উত্তরসূরীদের কাছে 'শ্রীচৈতন্যের অবতার' হিসেবে ধার্য হলেন, অথবা সেইভাবে তাঁদের কথা কীর্তিত করা হল। এবং এ জন্যেই:

১. "কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র আউলেচন্দ্র
তিনেই এক একেই তিন।"

২. "তিন এক রূপ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রী দুলালচন্দ্র
এই তিন নাম বিগ্রহস্বরূপ।"

কর্তাভজাদের প্রথম দুই গুরু আউলচাঁদ এবং দুলালচাঁদ উভয়কেই যেমন তাঁদের অনু-

গামীরা শ্রীচৈতন্যের অবতারকল্প গণ্য করেন, ঠিক তেমনই, খুশিবিশ্বাসীদের আদি গুরু খুশি বিশ্বাসকে তাঁর অনুগামীরা নবকলেবরে আবির্ভূত চৈতন্যদেব বলেই বিশ্বাস করেন, যদিও খুশি জন্মসূত্রে ছিলেন মুসলমান। গৌরবাদীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ধারানুবাহীদের চেয়েও নিজেদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে চৈতন্যানুসারী বলে ধার্য করেন শুধু এই কারণেই যে ভক্তের কাছে তিনি একই দেহে রাধা-ও-কৃষ্ণের সমন্বয়িত রূপ : রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ। এঁরা শুধুমাত্র গৌরাঙ্গের আরাধনাই করেন সেজন্যে—যা মূল শাখার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে অভাবনীয়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র, যিনি ন্যাড়া বলে কথিত শাখাধর্মের প্রবর্তক, তাঁর সম্পর্কেও ঐ চৈতন্যাবতারত্বের কথা বহুলভাবে প্রচারিত আছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক এই সব ধর্মধারাগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, জাতি-বর্ণ-ধর্মভেদ না করা। চৈতন্যদেব যে সামাজিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে এ-ব্যাপারই প্রধান ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা একদিকে, আর কাজী এবং তাঁর আজ্ঞাবহরা অন্যদিকে, যেভাবে জাত-পাত, যবন-কাফের, জলচল-অচ্ছুৎ ইত্যাদির অনুশাসনে ১৬শ শতকীয় নদীয়া-সমাজকে জর্জরিত করে তুলেছিল, তারই বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ রূপে উদ্ভাসিত হন চৈতন্যদেব। নব্যন্যায়ের পণ্ডিতযুবা নিমাই মিশ্র 'ন্যায়' অর্থে 'লজিক' এবং 'জাস্টিস'—দুইই বুঝেছিলেন। ফলে ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত সামাজিক অপবিধানের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যেভাবে, তাতে সর্বধর্ম, সর্ববর্ণ এক হয়েছিল যে, সেই কথা নতুন করে উল্লেখ করা বাহুল্য। কাজীর এজলাসে বিক্ষুব্ধ মিছিল নিয়ে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে, ওই সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শাসনশক্তি সরাসরি তাঁর গায়ে হাত না দিতে পারলেও এর 'বদ্‌লা' নিয়েছিল 'যবন' হরিদাসকে পীড়ন করে। আর সমাজপতির দল ত আক্ষরিক অর্থেই তাঁর গায়ে হাত তুলেছিল জগাই-মাধাইয়ের মারফতে। বৃন্দাবন দাসের জন্মবৃত্তান্তকে উপলক্ষ করে শ্রীচৈতন্যের ভাস্বর জীবনকে পঙ্কস্পর্শিত করার প্রচ্ছন্ন অপচেষ্টার কথাই বা মনে না করব কেন? তাঁর ধর্মের আধ্যাত্মিক বহির্কাঠামো বা সুপার-স্ট্রাকচার যেটি, সে সম্পর্কে আপত্তির কিছু কারোরই থাকার কথা নয়, ছিলও না। হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক অনুশাসনে না হলেও, ভাবগত ক্ষেত্রে একটা সহনশীল স্থিতিস্থাপকতার অভাব কোনো দিনই ঘটেনি। ফলত, হিন্দু সমাজের ভিতর থেকে যে চৈতন্য-বিরোধিতা মাঝে মাঝেই ফণা তুলেছে, তার মূল কারণটি অবশ্যই সামাজিক। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার মূল উত্তরসূরী বলে যাঁরা অধিষ্ঠিত হন, তাঁরা তখন নিজেরাও হিন্দু সমাজপতিদেরই

গোত্রভুক্ত হয়ে গেছেন। ধর্ম-বর্ণ জাতি-ভেদ-বর্জিত সামন্বয়িকতার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার দায়ভাগটা বর্তাল অপ্রাতিষ্ঠানিক শাখাগুলির উপর।

কিভাবে? সে-কথাতেই আসছি। ধরুন, বাউলদের কথাই: হিন্দু-মুসলমানের ধর্মধারায় সম্মিলিত হয়ে এই যে গোষ্ঠি এদেশে বিকশিত হয়েছে, এঁদের ভাবনার মূল কথাই হল প্রচলিত ধর্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে গিয়ে অন্তরের আনন্দ নিয়ে ঈশ্বর সন্ধান করা। লালন ফকিরের সেই বিখ্যাত গানটির কথা স্মরণ করলেই জাতি-ধর্ম ইত্যাদিকে কেমনভাবে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন, সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কি সে রে!"

উল্লেখনীয়, "কাষ্ট, ক্রীড অ্যাণ্ড সেক্স"-এর সাম্যের কথা আজ আমরা বলি, আমাদের সামাজিক জীবনে তার প্রথম প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যই। বাউলরা, তাঁর প্রবর্তিত ভাব-ধারারই উত্তরসরণ করেছেন।

ধর্ম এবং বর্ণবৈষম্য ঘুচিয়ে সামাজিক সাম্যের সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরভজনা শুধু বাউল নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য সব উল্লিখিত ধর্মধারাগুলিরও অভীপ্সিত। মুসলমান খুশি বিশ্বাসের প্রসঙ্গ ওপরে বলেছি। তাঁকেও যখন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অবতার বলে তাঁর অনুগামীরা মনে করেছেন, তখন একথা বলাই বাহুল্য যে হিন্দু-মুসলিম-বিভেদ-বুদ্ধিকে তাঁরা বর্জন করেছেন অনায়াসে।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে কর্তাভজাদের ক্ষেত্রেও; আউলচাঁদও যে জন্মসূত্রে মুসলিম ছিলেন, সে-কথা প্রশ্নাতীত। তাঁর প্রচারিত এই সামাজিক সমন্বয়বাদী ধর্মমতে শুধু চৈতন্যধর্ম বা সূফীধর্মই প্রতিফলিত হয়নি, এই সব গৌণ লোকধর্মের আধুনিক গবেষকরা [যেমন, সুধীর চক্রবর্তী, সনৎকুমার মিত্র] খৃষ্টধর্মেরও প্রতিভাস দেখেছেন সেখানে।

সাহেবধনীদের আদিপুরুষও [সুধীর চক্রবর্তীর সিদ্ধান্তে, তিনি নারী] ছিলেন মুসলমান। আল্লা, মহম্মদ এবং কৃষ্ণ ও রাধাকে এক করে সাধনার যে পদ্ধতি এঁদের মুখ্য প্রতিষ্ঠাদাতা কুবির গোঁসাই অভিব্যক্ত করেছেন, সেটির মধ্যে এঁদের যথার্থ সমন্বয়-

বাদী পরিচয় ফুটে উঠেছে। সামাজিক ভাবে, বরঞ্চ বলি পারিবারিক পদবীতে, এঁর যে নামেই পরিচিত হন না কেন, এঁদের নিজেদের মণ্ডলীতে হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র এই সব পরিচয় নির্মঙ্ক্ষিত।

এই ভেদহীনতার বোধ বাংলাদেশের প্রায় সব কটি লোকধর্মের মধ্যেই দেখি দরবেশরা বলেন—

"কেয়া হিন্দু কেয়া মোসল্‌মান
মিলজুলকে করো সাঁইজীকা কাম।"

বাউলদের ভাবাদর্শের সঙ্গে এঁদের বা সাঁইদের আদর্শ কিংবা আচারগত পার্থক্য খু সূক্ষ্ম। কর্তাভজাদের উপশাখা রামবল্লভীরা গীতা বাইবেল এবং কোরান তিনের অনুগামী, যীশাস, পয়গম্বর, নানক—সকলেরই উপাসনা করেন।

॥ ৫ ॥

এই গৌণধর্মগুলির সমন্বয়বাদী চরিত্রটি স্পষ্ট হলেও, একটি প্রশ্ন এখনো অনিরসি থেকে গেছে। সুপ্রাচীন লোকায়ত সাধনার উত্তরসাধনা কতখানি এই গৌণধর্মগু করেছে বা করতে সক্ষম হয়েছে, সেটি বিচার করা এখানে প্রাসঙ্গিক। লোকায় সাধনার ঐতিহ্য সমাজের নিচের তলার জনজীবনের মধ্যে প্রবহমান ছিল বরাবরই সে কথা আগেই বলেছি। এই লোকায়ত মত ছিল বেদান্ত-নিয়ন্ত্রিত, গীতা-পরিচালি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা-ভিত্তিক এবং নিষ্কাম কর্মসাধনা তথা কর্মফলবাদ কেন্দ্রিক ধ্রুবপা ব্রাহ্মণ্য ধর্মব্যাখ্যানের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির বিষয়বস্তু। মায়াবাদী বৈদান্তিক যেখানে ইহলোকের সুখ-দুঃখকে স্বপ্ন, মতিভ্রম ইত্যাদি বলে প্রচার করেছে, নিদে পক্ষে সে সবকে পূর্বজন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতির লব্ধফল রূপে ভবী ভোলাতে চেয়েছে- সেখানে লোকধর্মধারা জীবনের প্রত্যক্ষ চাওয়া-পাওয়াকেই গুরুত্ব দিয়েছে ব্রত-মান ইত্যাদির মধ্যে অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা, কামনা—এইসবের গুরুত্ব কতটা সেটি একবা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনী যা বলে দেবীর কাছে নিবেদন রূপে, তা-ই হল লোকায়ত সাধনার মূল কথা: "আমার সন্ত যেন থাকে দুধে-ভাতে।"

ধ্রুবপদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ধীরে-ধীরে যখন মঠ-মোহন্তভিত্তিক আকার ও চরি অর্জন করল, তখন তার মধ্যে মানবিক দিকটি স্তিমিতশক্তি হয়ে ওঠে; শ্রীচৈতন্য মানবিক দিকটিকেই মুখ্য করে তুলেছিলেন তাঁর সাধনার মধ্যে ফল্গুতোয়া রূপে বহম

ঐ লোকায়ত ধর্মধারার প্রবণতাটির কারণেই। ভুলে যাওয়া সঙ্গত নয় যে, শ্রীচৈতন্যের মতো মহানায়কও কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে বিকশিত হন, হতে পারেন ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মে এবং প্রয়োজনে। লোকায়ত ধর্মধারার ঐহিক-তথা মানবিক দিকটির ঐ নীরব অথচ নিশ্চিত অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রবুদ্ধ করেছিল তাঁর সাধনার অভিজ্ঞানকে মানবায়িত করতে। কান্তাপ্রেম এবং বাৎসল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই দুই ভাবগত অভিব্যক্তি সেই লোকজীবননিষ্ঠ অভিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত যে, তাতে সন্দেহ নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যখন প্রাতিষ্ঠানিক এবং পুরোপুরি অধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে চৈতন্য-দেবের প্রয়াণের কয়েক দশকের মধ্যেই, তখন তার মুখ্য চালিকা শক্তি হয় ইহমুখিনতা নয়, ইহবিমুখতাই। ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রভাবে যেমন একদা বৌদ্ধধর্ম তার বৈপ্লবিক ও মানবিক চরিত্রটি খুইয়েছিল, সেই পরিণতি ঘটল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও। 'কান্তাপ্রেম, বাৎসল্য—ইত্যাদি লোকায়ত ভাবনা তার মধ্যে নির্মজ্জিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু সে-সবই আধ্যাত্মিকতার গাঢ় অনুরঞ্জনে রঙিন্ হয়ে গেল: মানুষ এবং সমাজকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের মুখ্য ধারাটি পরমাগতি হল অনির্দেশ্য কৃষ্ণানুসন্ধানে। বেদান্তের মায়াবাদের মৌল অভিপ্রকাশের সঙ্গে এর পার্থক্য কতটুকুই বা!

পক্ষান্তরে মূল ধারার বাইরে যে শাখাধর্মগুলি ততদিনে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেছে, তাদের মধ্যেই বেঁচে রইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধর্মের সূচনা পর্বের লোকায়তি-কতা। ঈশ্বরসন্ধান অবশ্যই সেখানে অনুপস্থিত নয়, কিন্তু সর্বজনীন সম্প্রীতি এবং সমন্বয়ের ভাবনাও তাদের মধ্যে গৌণ নয়। এই ধর্মধারাগুলির মধ্যে সামাজিক নীতিবোধের মানদণ্ড অনেক সময়েই প্রয়োগ করতে গেলে বিব্রত হতে হয়। গুরুবাদ, কিশোরীভজনা, সর্বনারী শ্রীরাধিকা, ভিন্ন ধর্মধারাগুলির সঙ্গে বৈরিতা ইত্যাদি ব্যাপারের কারণে এরা বহুক্ষেত্রেই নিন্দা ও অবজ্ঞার ভাজন হয়েছে, এ কথাও স্মরণযোগ্য। কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও, এই ধর্মধারাগুলির সামগ্রিকভাবে একটা ধনাত্মক [অর্থাৎ পজিটিভ] দিক ছিল, সে কথা বলা দরকার। বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক হিন্দুসমাজের নিচের সিঁড়ির হাজার হাজার মানুষ এদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন একধরনের আত্মস্বীকৃতি সমাজে ঘৃণা এবং উপেক্ষা পুরুষানুক্রমে পেতে পেতে হতাশ হওয়া এঁদের মনে এক সময়ে আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন। উত্তরপর্বে যখন বৈষ্ণবধর্মের মুখ্য ধারাটিতে এঁদের আর ঠাঁই জুটল না, তখন এঁদের সান্ত্বনা এবং মানসিক আশ্রয়ের স্থলে পরিগণিত হল এই শাখা ধর্মগুলিই। পক্ষান্তরে, এ-ও হয়তো বলতে পারি, সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এদেরকে গড়ে তুলেছে মুখ্য বৈষ্ণবীয় ধারাটির

ারিত্রিক পরিবর্তনে সৃষ্ট হওয়া শূন্যতাকে পূরণ করতে। আমাদের এই শ্রেণী-বর্ণ-র্ম বিভাজিত বৃহত্তর জনসমাজের অন্তর্লীন বহু প্রতীপ-বিপ্রতীপ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বফল হিসেবে যে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় নিরন্তরভাবে প্রবহনশীল, তারই অনুষঙ্গে এই সমস্ত লৌকিক কাল্টগুলিও সেই টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করেছে অব্যাহত াত্তিতে, সঙ্গোপনে চলেআসা লোকায়ত প্রত্যয় ও সংস্কারসমূহের উপর। একটা প্রবল প্রবাহ এরা হয়ে ওঠেনি কোনো সময়েই, কিন্তু ছোট-ছোট ঢেউ হয়ে এরা লাকসমাজের বেলাভূমিতে আছড়ে-আছড়ে পড়েছে অনিবার্যভাবেই।

চৈতন্যধর্মের উত্তরাধিকার এই ধর্মধারাগুলির উপর বর্তিয়েছে, লোকায়ত প্রাচীন প্রত্যয় এবং সূফীধর্ম-ইত্যাদির থেকে এরা প্রাণরস আহরণ করেছে, উপেক্ষিত এবং অবহেলিত গণমানস এদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে। মূলত এই তিনটি প্রধান কারণের জন্যই এই সব গৌণ বৈষ্ণবীয় ধর্মগুলি আজও সমাজতাত্ত্বিকদের অন্বেষণের যোগ্য। আমাদের সমাজমনটির সঠিক ছবি আঁকতে যদি চাই তাহলে সেই অন্বেষণ করতে কিন্তু বেই, এই কথা বলেই কথা সাঙ্গ করি।

সেকালের চৈতন্য : একালের চৈতন্য

ক্ষেত্র গুপ্ত

প্রথম প্রস্তাব / কেন চৈতন্য ?

১.

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব, চৈতন্যকে মহাপ্রভু বলেন আমি সে-দলে নই, যদিও কারুর সঙ্গে আমার ঝগড়াও নেই। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁদের কোনো কালে কোনো যোগ ছিল না, তাঁরাও দেখি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলা পছন্দ করেন ; কখনও বৈষ্ণব নন—এমন সবাই চৈতন্যকে মহাপ্রভু বলেন। ঔপন্যাসিককে 'সাহিত্য সম্রাট', কবিকে 'ঋষি', অভিনেতাকে 'নটসূর্য' এবং রাজনৈতিক নেতাকে 'মহাত্মা' বা 'পণ্ডিত' বলে উল্লেখ করার ভাবাতিরেক ও অলঙ্কৃত অতিভাষণ থেকে মুক্ত থাকতে চাই বলে সব জাতের ভক্তের কাছে শুরুতেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

পৃথিবীর মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী—এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। অবিশ্বাসীরা এটাই অন্যরকম করে বোঝাতে চান। তাঁরা বলবেন, একদল ভাববাদী অন্য অংশ বস্তুবাদী। দুপক্ষেই আরও অনেক উপবিভাগ। যাঁরা এই দু-কোটির মাঝামাঝি কোনো জায়গায়, আপাতত তাঁদের কথা ধরছি না, কারণ প্রায়শ তাঁরা ছদ্ম ভাববাদী অথবা শেষপর্যন্ত ভাববাদে আত্ম সমর্পণের জন্য প্রতীক্ষমান। অবশ্য ভাববাদী বিশেষ কোনো দর্শন বা কার্যক্রমের ভেতরে বস্তুবাদী প্রবণতা থেকেও যেতে পারে, আবার ঠিক উলটোও ঘটা অসম্ভব নয়, অর্থাৎ বিশেষ কোনো বস্তুবাদী দর্শনে ভাববাদের চোরাবালি। এখুনি সে-সব গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন দেখি না।

চৈতন্য এক ধর্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব—'ধর্ম'র সহজগ্রাহ্য অর্থেই বলছি। এদেশে ভক্তি-ধর্মের একটা বিশাল আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রতি একজন বস্তুবাদীর আগ্রহ কেন জন্মাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। পাঁচ শ বছরের জন্মজয়ন্তী উৎসবে সামিল হওয়া তাকে মানায় কি ?

সন্দেহ নেই উপলক্ষটা জন্মজয়ন্তীই বটে। কিন্তু কোনো ভাবাপ্লুত উৎসবের দিক থেকে নয়,—পাঁচশ বছরের একটা বড় কালখণ্ডের ব্যবধানে একজন বড় মাপের মানুষকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তার এই সুযোগটা নেওয়া গেল। এই যা।

কোনো আন্দোলন, কোনো নেতা—ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক যা-ই হোন, তার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন উত্তরকালের পক্ষে জরুরি। পেছনের দিকে তাকিয়ে ভাবতেই হবে ঐতিহ্যের চরিত্রটা কি?

কেউ মনে করেন দেশের যা-কিছু প্রাচীন তাকেই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' বলে 'মাথায় তুলে' নিতে হবে। বস্তুবাদীদের একটা অংশে এই ঐতিহ্যবিলাস,[১] এবং অন্য দিকে অতীতের প্রতি প্রায় নির্বিচার বিরূপতা। যদি দ্বিধামুক্ত প্রগতিশীলতা না মেলে, যদি ষোল আনা বিপ্লবী চেতনা প্রকাশ না পায় তো কোনো পুরনো আন্দোলন বা নেতৃত্বকে তাঁরা মানবেন না। বিপরীত এই দুই প্রান্তের ভ্রান্তি আসলে একটাই। বোদ্ধারা বলেন অতি বাম বা অতি দক্ষিণ বিচ্যুতি—এক ভুলের দুই চেহারা।

অতীতের বিচারে বসে ধৈর্য ধরে দেখতে হয়। মনকে খুলে রাখতেই হয়। পেছন ফেরা মনোভাবে কখনো লুকিয়ে থাকে এগিয়ে চলার শক্তি, আবার উলটোটাও হতে পারে—তাকে আবিষ্কার করার দায় বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবীর। প্রগতি-প্রতিক্রিয়া-মিশ্র জটিল রূপের মধ্য থেকে প্রগতিশীল অংশকে ছেঁকে নেওয়া চাই।

ধর্মীয় আন্দোলন ভাববাদী দর্শন বলেই নাকোচ করে দেওয়া, কোনো কাজের কথা নয়। তারও বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এবং সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

৩.

আমরা যারা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, তাদের চৈতন্যসম্বন্ধে কিছু আগ্রহ তৈরি না হয়ে পারে না। চৈতন্য নানা দিক থেকে তাদের ঘিরেই রাখেন অনার্স এম. এ-র লম্বা চারটে বছর—

১. বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে গিয়ে,

২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে,

৩. মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায়।

১. দ্রষ্টব্য উৎপল দত্তের 'গিরিশ প্রতিভা' যেখানে গিরিশচন্দ্রের পেছনমুখী ভাবধারা এবং মধ্যযুগ-সুলভ মনোভাবকে প্রগতিশীল বলে ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে।

সেকালের আর কোনো একজন মানুষ এতটা জায়গা জুড়ে আমাদের কাছে আসেন নি, এবং এতটা সময় ধরে প্রবল প্রতাপে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন নি। চৈতন্য সম্পর্কে তাই না ভেবে থাকা যায় না—তিনি ভাববাদী বা সমাজমুখী বা আত্মকেন্দ্রিক ধর্মসাধক যা-ই থাকুন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব / সাহিত্য ও চৈতন্য

১. সে কালের সাহিত্য বর্তমানের ও সম্পত্তি।

খুব বড় নেতা, যুগান্তকারী আন্দোলনও কালক্রমে ইতিহাসের বিষয় হয়ে যায়। জাতীয় জীবনে তার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ চিহ্ন ক্রমে ফিকে হয়। কিন্তু সাহিত্য বা যে-কোনো শিল্প বেঁচে থাকে। অর্থাৎ শেকসপিয়র বা চণ্ডীদাস আজও লোকে পড়ে বা পড়তে পারে, সমকালের সাহিত্য যা দেয় তার অনেকটা আমরা এঁদের কাছে পেয়ে যাই। অবশ্যই পুরনো সব সাহিত্য এই অর্থে একালে পৌঁছয় না—সব যুগেই উঁচুমানের লেখার তুলনায় সাধারণ স্তরের সহিত্য বেশি থাকে। তার অনেকটাই ইচ্ছা করলেও পড়বার জন্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্য সে তুলনায় ভাগ্যবান। অনেক লেখাই মুদ্রিত হয়ে একালের হাতের সামনে সাজানো। সাহিত্য পাঠক তা সরাসরি ব্যবহার করতে, উপভোগ করতে, বিচার করতে পারেন। আর এক্ষেত্রে চৈতন্যকে প্রতিক্ষণ তাঁদের মনে রাখতে হয়।

ষোড়শ-সপ্তদশ এই দুই শতকের একটা বড় সময়কে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের 'চৈতন্যযুগ' নামে পরিচিত করতে চান। যাঁরা এ-রকম নামকরণের পক্ষে নন তাঁরাও সবাই মানেন চৈতন্যের প্রভাবই ঐ সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে চৈতন্য পন্থা এবং তার ভাব পরিমণ্ডলের দাপট ছিল প্রবলতম। অষ্টাদশ শতকে তার ধর্মীয় আন্তরিকতায় ভাঁটা পড়েছিল বলে ভক্তিবাদীরা দুঃখ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিকৃত কিংবা পরিবর্তিত, ম্লান কিংবা স্মৃতিবাহিত ব্যাপকতায় ঘাটতি দেখি না।

সাহিত্যের দিক থেকে দুটি নক্সার সাহায্যে এই ব্যাপকতা এবং কালগত বিকশমান-পরিবর্তমান পরিস্থিতির পরিচয় দিচ্ছি।
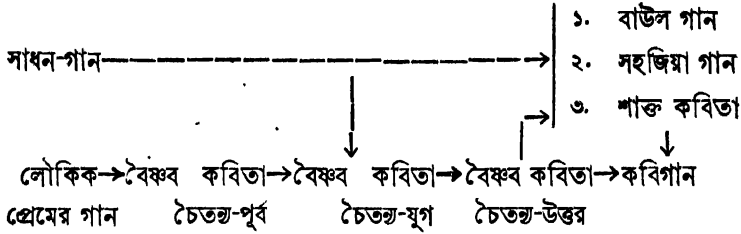
এই নক্সায় বৈষ্ণব কবিতার উদ্ভব এবং বিকাশ ও পরিণতি দেখান হল। বাংলায় এবং অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতে, প্রাকৃত-অপভ্রংশে মানবিক প্রেমের অনেক গান লেখা হয়েছে। সঙ্গত অনুমান মুখে মুখে অনেক লৌকিক গানও ছিল। কোথাও রাধাকৃষ্ণের নাম জোড়া থাকত, তা যে কোনো তরুণ নরনারীর প্রতীকী নাম[1], কোথাও থাকত না—কোথাও ধর্মভক্তির ব্যাপার কিন্তু ছিলনা। এই সূত্রেই চৈতন্য-পূর্ব বাংলায়, মিথিলায় বৈষ্ণব কবিতার জন্ম হয়েছে।[2] সমান্তরাল ভাবে নানাধরনের সাধনসঙ্গীতের একটি ধারাও ছিল, য'তে সাধনভজন ও ধর্মীয় উপলব্ধির কথা কবিরা বলতেন। বাংলা চর্যাগানে, সরহ ও কাহ্নুর দোঁহাকোষে (অবহট্টে রচিত) এর নিদর্শন আছে। বিদ্যাপতি মৈথিলিতে যখন রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবিতা লিখছেন তখন তিনি লৌকিক-মানবিক সঙ্গীত ধারার অনুগামী। আবার যখন 'তাতল সৈকতে' জাতীয় প্রার্থনার গান লিখছেন তখন সাধন-সঙ্গীতের ধারাটির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর প্রেম-কবিতার মাধব আর প্রার্থনার মাধব নামে এক হলেও একেবারেই পৃথক। একজন প্রেমিক যুবক, অন্যজন স্বয়ং ব্রহ্ম।

চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদে এই দুই ধারার সংযোগ ঘটল। প্রেমের গান হয়ে উঠল সাধনার গান, কিন্তু এই সাধন-সঙ্গীতও প্রত্যক্ষত নরনারীর প্রেমেরই কথা। এই দুই ধারার মিলন কতটা অচ্ছেদ্য, কতটা দ্বন্দ্বগর্ভ তা অবশ্য বিচারের বিষয়। এই মিলিত ধারার উত্তরাধিকারী চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা। আবার সাধন-সঙ্গীত ধারার কালানুক্রমে বিকশিত রূপগুলি, যেমন বাউল গান, সহজিয়া গান, শাক্ত কবিতা—কিন্তু চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবকেও আত্মসাৎ করে নিয়েছিল।

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব কবিতা, বৈষ্ণব কবিতা প্রভাবিত শাক্ত কবিতা (উমাসঙ্গীত)— এর যৌথ ঐতিহ্যে গড়ে উঠল কবিগান।

১. রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য (সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ)
২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে।

নক্সা—২

বিষয়	চৈতন্য-পূর্ব	চৈতন্য-প্রভাব
পদাবলী বা বৈষ্ণব গীতিকবিতা	রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কবিতা [উদা, বিদ্যাপতি]	১. রাধাকৃষ্ণ প্রণয় কবিতা [প্রাচুর্য ; নতুন তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ ; নতুন নতুন মুডের সংযোজন] ২. বাৎসল্য রসের কবিতা ৩. সখ্য রসের কবিতা ৪. গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা ৪. ১. মানবিক ৪. ২. তাত্ত্বিক ৫. ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ৬. কবিগান [সখীসংবাদ ও বিরহ]
আখ্যান	১. ভাগবতের অনুবাদ [উদা, মালাধর] ২. কৃষ্ণলীলা কাহিনী [উদা, বড়ু চণ্ডীদাস]	কৃষ্ণলীলা কাহিনী
জীবনী	—	১. চৈতন্য-জীবনী ২. অন্য মোহান্তদের জীবনী
তত্ত্বগ্রন্থ	—	১. চৈতন্য জীবন সংশ্লিষ্ট [উদা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ] ২. কড়চা-নিবন্ধ
সংস্কৃত-রচনা	কাব্য-কবিতা [উদা, জয়দেব]	১. কবিতা ২. চৈতন্য-জীবনী ৩. দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাখান ৪. রসপর্যায় বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

উপরের নক্সায় বৈষ্ণব সাহিত্যের নিজস্ব পরিমণ্ডলে চৈতন্যপ্রভাবের ফলে কি ধরনের বদল ঘটেছে তার একটা পরিচয় দেওয়া হল। চৈতন্য-পূর্ব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য নানা রূপে বর্তমান ছিল। কাছাকাছি অন্য অঞ্চলগুলি থেকেও বৈষ্ণব-সাহিত্যের কিছু সম্ভার এসে পৌছত। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় কবিতা এদেশে পরিচিত এবং প্রিয় ছিল। বাংলা, মৈথিলি এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্যে চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ, চৈতন্যপন্থী দর্শন সাধনতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদ বড় রকমের প্রভাব ফেলেছিল। নক্সাটিতে তা-ই দেখান হল। একটু ব্যাখ্যা করা যাক—

১. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস (চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলীকার)[1] যে ধরনের গীতি কবিতা লিখেছিলেন তার ভাবে-রূপে অনেক কিছু সংযোজিত হল। অনেক বেশি সংখ্যক কবি প্রচুর কবিতা লিখতে লাগলেন। বৈষ্ণবদের আখড়াগুলো কবিতা লেখার কেন্দ্র হয়ে উঠল। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরাও কিছু কম উৎসাহী ছিলেন না। কবিতা লেখা আর গান করা ভক্তি সাধনার অঙ্গরূপে গণ্য করা হল। এঁদের রচনায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ত্বব্যাখ্যান অনুযায়ী নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হতে থাকে—প্রেমের কবিতা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠে যায়। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'—'উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে নানা রস পর্যায়ের (যাকে আধুনিক অর্থে বলা যায়, প্রেম-ভক্তি আশ্রয়ী স্বভাব ও পরিস্থিতি মাফিক বিচিত্র মুড) কবিতা লেখাই তখন থেকে সর্বজন গ্রাহ্য রীতি হয়ে দাঁড়াল। কিছু পরে কীর্তন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে এ জাতীয় পদ রচনার প্রয়োজন আরও বেড়ে গেল।

২. এতকাল বৈষ্ণব পদাবলীর একমাত্র বিষয় ছিল প্রেম। চৈতন্যযুগ থেকে বাৎসল্য এবং সখ্যরসের কবিতা লেখা শুরু হল। স্বয়ং চৈতন্যকে নিয়ে গীতিকবিতা লিখলেন অনেকে। কোথাও জোর পড়ল মানবিক ভাবের উপরে, যেমন নিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গে, কেউ লিখলেন চৈতন্য-তত্ত্বের আশ্রয়ে যার মূল বিশ্বাস, তিনি রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে নিজেকে আস্বাদ করার জন্য মর্তে অবতীর্ণ।

৩. বৈষ্ণব কবিতায় বাংলা ভাষার পাশাপাশি একটা দ্বিতীয় কাব্য-ভাষার আবির্ভাব ঘটেছিল—ব্রজবুলি নামে যার পরিচয়। হয়ত এর উৎস বিদ্যাপতির মৈথিল কবিতা পর্যন্ত পৌছবে। তবে চৈতন্য যুগ থেকেই এর বহুল ব্যবহার।

---

১. চণ্ডীদাস সমস্যায় যাচ্ছি না। চৈতন্যের পরেও হয়ত এই নামের কবি ছিলেন। তবে আগে যে একজন ছিলেন তাতে আমার সন্দেহ নেই। তিনি কৃষ্ণকীর্তনের লেখক না ও হতে পারেন।

৪. বৈষ্ণব গীতি কবিতাকে চৈতন্য-আন্দোলন যে প্রবল গতি দিয়েছিল— আঠারোর শতকে সখীসংবাদ-বিরহ শ্রেণীর কবিগানের জন্ম পর্যন্ত তা কাজ করে চলেছে।

৫. বৈষ্ণব আখ্যান কাব্যের দুটি ধারা চৈতন্য পূর্ব যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ভাগবতের অনুবাদে অনেকটা মূলের অনুসরণ, যেমন মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। দ্বিতীয়ত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনী যা লোকউৎসে জাত, যেমন বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।' চৈতন্য যুগ থেকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের প্রাধান্য ঘটল। কারণ চৈতন্য ভাবনা ভগবান কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যে বা বীর্যে নয়, মাধুর্যে লীলাময় রূপে অনুভব করতে চায়। পদাবলীর সঙ্গে এই ধরনের আখ্যানেরই সুসঙ্গতি।

৬. একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার জন্ম হল। চরিত-সাহিত্য। চৈতন্যের জীবন কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি বাংলা কাব্য লেখা হয়। সেই আদর্শে আরও কয়েকজন বৈষ্ণব-প্রধানের জীবনীও রচিত হয়েছিল। পার্থিব মানুষের জীবন কথা (তা তিনি ধর্মগুরু বা ঈশ্বর-অবতার যেভাবেই বন্দিত হন) এইভাবে কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠা সেকালের সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই বড় ঘটনা।

৭. চৈতন্য-উত্তরকালে বৈষ্ণবদের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কিছু কিছু ছোট বই লেখা শুরু হল। এগুলিকে বলা হয় 'কড়চা-নিবন্ধ। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' চৈতন্যের জীবনকথা বলতে গিয়ে কবি নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। পরেকার ছোট ছোট কড়চা-নিবন্ধের পুথি অনেক পাওয়া গিয়েছে।

৮. বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকচর্চার আগে বাঙালী সংস্কৃতভাষায় কাব্যাদি লিখত। সে প্রথা পরেও বন্ধ হয়ে যায় নি। চৈতন্য প্রভাবের ফলে সংস্কৃতে কবিতা নাটক লেখা বেড়ে গেল। দর্শন ও রসতত্ত্বের নানা গ্রন্থও রচিত হতে লাগল। বলা যায়, কবিতার বেলায় বাংলার স্থান অনেক উঁচুতে হলেও তত্ত্বগ্রন্থের দিকে সংস্কৃতের প্রাধান্য।

চৈতন্য এবং চৈতন্যান্দোলন বাংলার সাহিত্যজগতে এত বড় বড় সব ঘটনা ঘটিয়েছে।

২.

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের ভূমিকা শুধু বুদ্ধিজীবী সাহিত্য বিশেষজ্ঞের আলোচনা গবেষণার বিষয় হয়ে থাকতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। বৈষ্ণব সাহিত্য, বিশেষ করে পদাবলী কাব্যপাঠকের সামনে উপভোগের বস্তু হিসেবে হাজির রইল।

শুধু কীর্তন শোনার ব্যাপারে নয়, কবিতা রূপে পড়বার জন্য বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে পদাবলী সমকালের বাংলা সাহিত্যের পাশে সমতুল্য বলে গণ্য হয়ে আসছে, এমনকি পরিশীলিত মনের কাছেও। এবং বৈষ্ণবপদাবলীর কয়েক হাজার কবিতার মধ্যে এমন কিছু আছে যা যে কোনো সাহিত্য বিচারের কঠিনতম মানদণ্ডেও পুরো দাম পাবে।

যদিও বৈষ্ণব কবিতার আলোচনাতে—ব্যাখ্যাতে তাত্ত্বিকতার মাত্রা রক্ষা করাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কীর্তনের আসরে আখর সহযোগে গানের উদ্দেশ্যই ছিল পদগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যেমন নাকি গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ গাইতে গিয়ে কীর্তিনীয়া সযত্নে বোঝাতে থাকেন, এ কোনো পার্থিব প্রেমিকার নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রকট বৃন্দাবনে দ্বাপরে ঘটে থাকলেও তা লোকায়ত নয়। রাধাপ্রেমের ঐ ব্যাকুলতা ও আত্মভাব বিস্মরণ জীবের কাছে শিক্ষণীয়। সব বাধা ভেঙে সব ত্যাগ করে রাধার যে অভিসার 'শঙ্কিল পঙ্কিল বাটে' ঘন ঘন বজ্রপাতের মধ্যে তারই আদর্শে ভক্তির তীব্রতা নিয়ে চলতে হবে ভগবানের দিকে। রাধা জীবকুলের শিক্ষাগুরু। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মোটেই রূপক নয়। তবে তা অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির প্রণয় লীলা। ভক্তের তাতে অধিকার নেই। ঐ লীলারস আস্বাদন করতে করতে তটস্থা জীবশক্তি রাধার আনুগত্যময়ী সেবার সাধ্যবস্তুর জন্য সাধনা করবে। ধর্মতত্ত্ব সাধনতত্ত্বের এইসব জটিল খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতেন ভক্ত কীর্তনীয়া। আমরা যখন প্রথম তারুণ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসুক পাঠক, আমাদের কলেজ-শিক্ষকেরা কীর্তনীয়াদের ভূমিকাই পালন করতে চাইতেন। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি বিরূপতা ও ভীতি তবুও যে জাগেনি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের দু-চারটি মন্তব্য বা কবিতার অংশে মন আশ্রয় পেয়েছিল। সে-যাই হোক, তত্ত্ববোদ্ধা ভক্ত ছিলেন বলে গোবিন্দদাস এই বোধ থেকেই অভিসারের পদ লিখেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির লেখা গাইতে গিয়েও একই ভাষ্য দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও বিদ্যাপতি অনুরূপ কোনো ভাবনা থেকে অভিসারের কবিতা বা কোনো কবিতাই লেখেননি, ঐতিহাসিক কারণেই তাঁর তেমন কিছু করা সম্ভব ছিল না।

শুধু কীর্তনীয়ার আখরে নয়, আধুনিক সমালোচনায় কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনেও এই একই আদর্শ চলে আসছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলীর' ভূমিকায় লেখা হল—বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। এই

লাইন ধরে বৈষ্ণব কবিতা বিষয়ক ভাবনা আজও চলছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই তাত্ত্বিকতা বাদ দিয়ে ঐসব কবিতা সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন।[১]

বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে আজও দেখব তিনটি প্রবণতা

১. তত্ত্বাশ্রয়ী ব্যাখ্যান

২. তাত্ত্বিক ও মানবিক ব্যাখ্যানের মিশ্রণ

৩. মানবিক ও শিল্পগত বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের সহচর্য সত্ত্বেও তৃতীয় ধারাই সবচেয়ে ক্ষীণ, কিন্তু একমাত্র এপথেই বৈষ্ণব কবিতা একালের পাঠকের কাছে বেঁচে থাকতে পারে।

যাঁরা বৈষ্ণব তত্ত্বের চেয়ে বেশি বয়সী তাঁদের কবিতা বিচারে ধর্ম ও সাধনার কোনো কথা উঠতেই পারে না। ভক্তরা নিজেদের মনোমত ভাব ও রস যে কোনো লেখা থেকে ছেঁকে নিতে পারেন। সম্ভবত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেমোন্মাদ চৈতন্যকে সেভাবেই বিহ্বল করত। এতে রচনার বাস্তব রূপের কিছু দায় নেই।

তবে বেশির ভাগ কবি তত্ত্ব জেনে বুঝে পদ লিখেছেন। পদ রচনাকে সাধনার অঙ্গ বলে ভেবেছেন এবং সে-কারণে ভক্তমণ্ডলীর কাছে সমাদৃতও হয়েছেন। কিন্তু সব ভক্তই কবি নন। এবং সব কবিতাও ভক্তিতে সমর্পিত বা নিঃশেষিত নয়—বাইরের দিক থেকে সবাই অবশ্য ভক্তিবাদী, ভেতরে সর্বদা নয়। আসলে কবিত্ব এবং ভক্তি এক বস্তু নয়। এদের মধ্যে সাভাবিক কোনো সম্পর্কই নেই। ফলে

১. ঠিকঠাক ভক্তিভাব প্রকাশ করলেও কবিতা হিসেবে কোনো লেখা পুরো ব্যর্থ হতে পারে।

২. ভক্তির উপরে নির্ভর না করেই অনেক রচনা পারে ভালো কবিতা হয়ে উঠতে।

দুজন নামী কবির কথাই বলা যাক। গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাস। গোবিন্দদাসের অনেক কবিতাই তত্ত্ব ও সাধনার কথা। বড বেশি সচেতন। অলঙ্কার চাপিয়ে তাকে রূপময় করে তোলার চেষ্টা। বিশেষ করে 'শ্রবণ বিলাসী' কবি ধ্বনি ঝঙ্কারের আশ্রয় নিয়ে কানের সস্তা দাবি মেটাতে চেয়েছেন। ভেতরের ফাঁকটা হয়ত তিনি কোনো ভাবে মনের গভীর স্তরে বুঝতে পারতেন। তাঁর অভিসারের বিখ্যাত পদগুলির বেশিই উচ্চরব দিয়ে আঁকা ছবি, তাতে অনুভূতির রঙ অতি ক্ষীণ। রাধা যেখানে ঘড়াঘড়া

১. 'রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারকগ্রন্থে' আমি বৈষ্ণব কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সব আলোচনা ও মন্তব্য বিশ্লেষণ করে এই কথা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলাম।

জল ঢেলে উঠোন পিছল করে চোখ বেঁধে বর্ষায় অভিসার যাত্রা অভ্যাস করছে তাতে কল্পনার চমক আছে, কঠিন সাধনার সজ্ঞান ছবি আছে কিন্তু অভিসারিকার সত্যকার কামনার রক্তরাগ নেই।[১]

গোবিন্দদাসকে নিদর্শন হিসেবে বেছেছি এই কারণে, তিনি উঁচুমার্গের তাত্ত্বিক, অলঙ্কার বিশারদ এবং পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ব্যর্থ কবি হলেও মনে হয় তিনি কাব্য বোদ্ধা ছিলেন, তাই কবিত্বের ঘাটতি নানাভাবে পূরণ করতে গলদঘর্ম হয়েছেন।

তুলনায় জ্ঞানদাসের কবিতার মেজাজই আলাদা। যদিও তার রসপর্যায় মিলিয়ে লেখা পদগুলি একেবারে নীরস, কিন্তু বেশ কিছু কবিতা আছে যা রূপমোহে উদ্বেল চিত্তের খবর আনে। একটু এলোমেলো উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, দুই-চারটি একান্ত লৌকিক শব্দের প্রয়োগে জ্ঞানদাস বিহ্বল হৃদয়কে ধরে রাখেন, বস্তুর সীমা উপচে মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। ভক্তি ধর্ম কবির মধ্যে কোথাও থাকলেও কবিতায় তা নেই ; রচনা ও কল্পনার ও অনুভূতির অভিনব মিলনে এর সার্থকতা।

শুধু নাম করা কবি ধরে নয়, একত্র কটি কবিতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আমরা বেশ কিছু লেখা পাব (একেবারে সঠিক হিসেব দিতে পারব না, তবে একশ থেকে দেড়শর মধ্যে নিশ্চয়ই হবে) যা পাঠযোগ্য ভালো কবিতা এবং বিশ-পঁচিশটি অতি উত্তম পদ চিহ্নিত করাও সম্ভব হবে।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক—সময়ের অনেক ফারাক, তবুও এই রস-রূপ সম্ভোগের আয়োজন তারা করে রেখেছে, তার পেছনে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছে চৈতন্য-আন্দোলন। এই আন্দোলনের আগে এক-আধজন কবিরই খোঁজ মিলছে। বহির্বঙ্গ থেকে যে বিদ্যাপতিকে এনে নিজের করে ফেলা তাও কি সম্ভব হত চৈতন্য-আন্দোলন না ঘটলে। আজকে বৈষ্ণব কবিতার সম্ভোগ করার সময়ে তাই চৈতন্যকেন্দ্রিক ভক্তি-আন্দোলনের বিস্তারের কথা মনে আসদেই।

সঙ্গে সঙ্গে উল্টো আর একটি চিন্তাও কিন্তু এড়ানো যাবে না—যে চৈতন্য-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থ তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করেই ভালো মানের পদরচনা সম্ভব হয়েছে।

১. বহুকাল আগে 'প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' নামে একটি বই লিখেছিলাম। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই বইয়ের 'গোবিন্দদাস' ও 'জ্ঞানদাস' প্রবন্ধ দুটি দেখা যেতে পারে।

আগে থেকে সত্যকে মেনে নেওয়া ভালো। দীর্ঘকাল পরে কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব বা আন্দোলনের স্মৃতি ও ঐতিহ্য মূল্যবান বলে টিকে থাকতে পারে নয় সত্যাসত্য বিচারের উপরে দাঁড়িয়েই। অলঙ্কৃত ও বর্ণাঢ্য কল্প পরিচয় এবং আবেগজাত, অতিভাষণ শেষ পর্যন্ত কাজে আসে না।

তৃতীয় প্রস্তাব / ভক্তিবাদ : কর্ম থেকে জ্ঞানে

১.

চৈতন্যের জীবন-কাহিনী নিয়ে তাঁর সমকালে এবং পরে সংস্কৃতে ও বাংলায় অনেকগুলি বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে যে চারটি বাংলা বই বহুল প্রচারিত,—ছিল, তার কোনোটিতেই পুরো বস্তুনিষ্ঠা আছে এমন দাবি অতিবড় ভক্তও করবেন না। আবার চারটি বইই খুব শ্রদ্ধাপূত চিত্তে লেখা হলেও কোনো ভক্তের পক্ষে একই সঙ্গে চারটি বইকে ঠিক বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ তিনটি একেবারে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বই চারটি লেখা।

১. কলিযুগে পাপের বিনাশ ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবানের আবির্ভাব চৈতন্যরূপে, ঠিক যেমন ঘটেছিল দ্বাপরে। ভাগবতে কৃষ্ণের যে লীলা, নবদ্বীপে সেই ভূমিকা চৈতন্যের। বৃন্দাবন দাস এই সত্যে বিশ্বাস করে জীবনী লিখেছেন।

২. চৈতন্যের মধ্যে প্রেমিক কৃষ্ণকে দেখতে চেয়েছেন লোচন দাস। জয়ানন্দ ও একই চিন্তার কিছুটা অংশীদার। 'নদীয়া নাগর' ভাব নামে এই মনোভাব বৈষ্ণব ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে কৃষ্ণ আবির্ভূত চৈতন্যরূপে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ-আস্বাদন, রাধার প্রেমমুগ্ধ চিত্তে কৃষ্ণরূপের উপলব্ধি এবং কৃষ্ণকে ভালোবেসে রাধার আনন্দ—এই সব কিছুর আশ্রয় হলেন রাধা, বিষয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আশ্রয় রূপে এর স্বাদ পাবার অভিলাষী। তাই অবতীর্ণ হলেন 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' কৃষ্ণ—এই হল চৈতন্যাবতারের মর্মকথা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা।

শেষ পর্যন্ত চৈতন্যচরিতামৃতের' দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ত্বব্যাখ্যা বৈষ্ণব প্রধানেরা পুরোপুরি মেনে নেন। তবুও বৃন্দাবনদাসকে অস্বীকার করা সম্ভব

হল না। বিশেষ করে চৈতন্যের নীলাচল-পূর্ব জীবনের তথ্যগত বিবরণের জন্য তাঁকেই মান্য করা হল। কিন্তু গৌরনাগরী ভাবটি অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে আর প্রশ্রয় পেল না। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সহজিয়া বৈষ্ণবদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে যে আরোপ সাধন তত্ত্ব[১] প্রচলিত ছিল, তার মূলে গৌরনাগরীভাবের কোনো সূত্র সক্রিয় ছিল কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, গৌরনাগরীভাবনা বা আরোপ সাধনার ভিত্তিটা লৌকিক। চৈতন্য অবতারতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চ মার্গের দার্শনিকতা ও সাধনতত্ত্বকে একান্ত জনবোধ্য, সরল এবং পূর্বপ্রচলিত তান্ত্রিক-সহজিয়া আচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গৌরনাগরী ভাব ও আরোপ সাধনার জন্ম, এরূপ অনুমান করার সুযোগ আছে।

সে যা-ই হোক, এইসব চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের উপর নির্ভর করেই চৈতন্য আন্দোলনের উত্থান-পতনকে চিনে নিতে হবে। অতিলৌকিককে বর্জন করে অতি-ভাষণকে সরিয়ে তথ্যে পৌছতে হবে। আর রচয়িতার ধর্মীয়-দার্শনিক বিশ্বাসকে সামাজিক কার্যকারণের সূত্রে বিশ্লেষণ করা দরকার হবে।

২.

এদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রায়ই জন্মকালে শাস্ত্রীয় ধর্মানুশীলনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো। হিন্দুর বর্ণশাসিত এবং ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় বিধিবিধানের বিরুদ্ধে মধ্যযুগে,—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তি-আন্দোলন বিচিত্র রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। কোথাও কোথাও এই প্রতিবাদী আন্দোলনের উদ্ভব অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে। যদিও সরাসরি সামাজিক-অর্থ নৈতিক শোষণের বিরুদ্ধতা করার কার্যক্রম এই আন্দোলনের ছিল না, থাকার কথাও নয়। তবুও বাঁকাভাবে ধর্মভিত্তিক এই প্রতিবাদের মধ্যে ঐসব বাস্তব বিরোধী ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্গদেশে চৈতন্যের নেতৃত্বে যে ভক্তি-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার প্রথম দিকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক।

১. ইসলামী সূফী-সাধনার প্রভাব উত্তর ভারতের সর্বত্র ভক্তিবাদী গোষ্ঠীগুলির উপরে পড়েছিল। বাংলার চৈতন্যপন্থায় সাধারণভাবে এর কিছু ছাপ থাকা সম্ভব।

১. 'অব্‌সকিওর রেলিজিয়াস কাল্টস্‌'—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত দ্রষ্টব্য।

সুনির্দিষ্টভাবে এর কোন্ কোন্ অংশের সঙ্গে চৈতন্যপন্থার সাদৃশ্য তা ঠিক করা দুরূহ। কিন্তু ভেতর দিকে কোনো গভীর আত্মীয়তার আকর্ষণ না থাকলে, পরবর্তীকালে এত সহজে ফকির-বাউলদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চৈতন্য স্বয়ং পরমতত্ত্ব রূপে গৃহীত হত না এবং হিন্দু-মুসলমান সহজিয়াদের এত নৈকট্য ঘটত না।

২. পরে দেশের নিচের দিকে কোথাও কোথাও ভক্তিসাধনায় হিন্দু-মুসলমান, এই দুই প্রধান সম্প্রদায় মিলতে পেরেছিল এবং বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক ঐক্যের একটা সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। চৈতন্য পন্থায় কিন্তু তার সূচনা দেখি না। এক-আধজন যবন হরিদাস ধর্মসমন্বয়ের নিদর্শন নয়, বরং যে যুগে বহু হিন্দুর মুসলমান হয়ে যাওয়াই সামাজিক সত্য তার একটা প্রতিবাদ মাত্র। আসলে হিন্দুয়ানির সীমা অতিক্রম করা চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের কার্যক্রম হয়ে ওঠেনি। যদিও নানকের ভক্তিবাদ হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষ এক তৃতীয় ধর্মের সৃষ্টি করেছিল, এবং কবীরে দুই ধর্মের ভক্তিবাদী সারবস্তুর মিলন ঘটাবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু চৈতন্যপন্থার গভীরে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা সুদৃঢ় ছিল,—তাই সুফীপ্রভাব কিছু পরিমাণ গ্রাস করা হলেও তার টানে চৈতন্য-আন্দোলনের হিন্দুয়ানি একটুও টাল খায়নি।

৩. কবীরের বা দাদূর ভক্তিবাদ সমাজের নিম্নস্তরে জন্মেছিল। উচ্চ বর্ণের অল্প সংখ্যক উদারচেতা লোকের কাছে প্রশংসিত হলেও মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির মধ্যেই তা লালিত। অন্যদিকে নানকের ভক্তিধর্ম একটা সংহত জাতি গড়ে তুলেছিল, রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষা দিয়েছিল। তার প্রতিবাদী রূপ দিল্লির আগ্রাসী শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাদৃঢ় হতে পেরেছিল। চৈতন্য-আন্দোলনের কোথাও এই রাজনৈতিক চেতনা বা সক্রিয়তার পরিচয় নেই। আবার সামাজিক-অর্থ নৈতিক বিন্যাসের নিম্নকোটির মানুষের মধ্যেও এই ভক্তিবাদ জন্মায়নি। উচ্চবর্ণ এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর নেতৃত্বে এই ভক্তিশাখার উদ্ভব। শুধু তা-ই নয়, বিকাশ ও পরিণতির কোনো স্তরে তাঁদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়নি। অবশ্য এর একটা জনমুখী আবেদন ছিল। উচ্চ কোটিতে জন্মেও এই ধর্ম হরিভক্ত চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিল। বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের মতো এই বাক্যটির অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রসারিত ও কার্যকর করে তুলতে নিত্যানন্দ গুরুতর ভূমিকা নিয়েছিলেন। চৈতন্যপন্থা নিম্নস্তরের ধর্মীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার পতাকা হয়ে উঠেছিল।

৪. নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলন কর্মমুখী একটা রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, অন্তত চৈতন্য ভাগবতের তা-ই হল সাক্ষ্য। শ্রীবাসের আঙিনায় যৌথ

নামগান, নগর সঙ্কীর্তনের উদ্ভাবনা, জগাই-মাধাই দমন, কাজীর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় গণপ্রতিবাদ প্রভৃতি ভক্তিকে কর্মে দীক্ষিত করেছিল। একটা পর্যায়ে এই কর্মমুখিতা চৈতন্যপন্থাকে একটি সামাজিক (এমন কি প্রায় রাজনৈতিক) তাৎপর্য দিয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে প্রায় বীরবেশে সজ্জিত গুরুর ধর্মপ্রচার, বর্ণভেদবিরোধী চিঁড়ামহোৎসব প্রভৃতিকে এই কর্ম প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এর ফলে একটা গণউত্থানের আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠেছিল। ঠিক বিদ্রোহে উন্মুখ না হলেও এর মধ্যে সাধারণ মানুষ আত্মমর্যাদাকে খুঁজে পাচ্ছিল।

৫. কিন্তু সব কিছুই যেন শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধী হিন্দুত্বে পরিণত। আরও ঠিক ভাবে বললে বৈষ্ণবদের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠাই যেন এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল—অন্তত চৈতন্যভাগবতের প্রতিপাদ্যই তাই। কালের সঙ্কট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তান্ত্রিকদের নিন্দা করেছেন, মঙ্গল দেবতার পূজকদের ভৎর্সনা করেছেন, লৌকিক ধর্মাচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'কালভুজগ ভয়'টা কি এখানে?' অথবা কাজীর পরোয়ানায়—যাকে বলা যায় হিন্দুধর্মের স্বাধীন আচরণের উপরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ? বৃন্দাবনদাসের ইঙ্গিত, কাজীকে উসকেছিল পষণ্ডীরা, অর্থাৎ অবৈষ্ণব হিন্দুরাই। আর কাজীও মদ্যমাংস দিয়ে যক্ষপুজো করায় কিংবা রাতজেগে সোরগোল তুলে মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাওয়ায় আপত্তি করে নি। কাজী-সংক্রান্ত ঘটনাটি পড়ে যে সামাজিক ধর্মীয় প্রতিরোধের ছবি পাওয়া যায়, তাকে বৃন্দাবনদাস শুধুমাত্র বৈষ্ণব ধর্মের গৌরবে এবং প্রচলিত অন্য ধরনের হিন্দুয়ানির প্রতি ধিক্কারে এমন ভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, যাতে এর তাৎপর্য অনেক সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।

৬. চৈতন্য কেন পুরীতে চলে গেলেন তার গূঢ় কারণ বলা কঠিন। কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি—যে কোনো ধরণের আন্দোলনের নেতা নিজ ভূমি থেকে যখন চলে যান, বোঝা যায় আন্দোলন পর্যুদস্ত এবং নেতা পিছু হটলেন কিংবা নতুন পথে এবারে তাঁর যাত্রার প্রস্তুতি। চৈতন্য সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলার মতো উপাদান নেই। নবদ্বীপে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তায় ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীরা বা মুসলমান শাসকেরা কি ভীত হয়ে পড়েছিল? প্রত্যাঘাতের কথা ভাবছিল? তাই ভক্তরা তাঁকে ঘটনাকেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিল। নবদ্বীপে চৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলন যে সামাজিক সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছিল তাকে কোন্ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, তাঁর জানা ছিল না। একটা রুদ্ধ পথের প্রান্ত দেখে এই কি তাঁর পিছু হঠা? তবে নিরাপত্তার প্রশ্ন কিছুটা ছিলই, মুসলমান রাজশক্তি সম্বন্ধে কিছু সতর্কতা, তা না হলে উত্তর-পশ্চিম দিকে

না গিয়ে পুরীর হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া কেন? শুধু মায়ের ইচ্ছা বলে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

৭. পুরীতে চৈতন্য মহিমা যতই বিস্তৃত হোক, জনজীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় হিসেবে সপার্ষদ তাঁর অবস্থান। ভক্তিভাবে বিভোর চৈতন্য সামাজিক কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত। নগরসঙ্কীর্তনের পৌরুষের স্থানে এসেছে আত্মমগ্নলীলারস আস্বাদন। শুধু আশ্রমের কোণে পলায়ন নয়, নিজের মধ্যে অবগাহন—আপনার প্রণয় সম্ভোগের তত্ত্ব যাঁরা আবিষ্কার করলেন তাঁরা এই নির্বাসনকে নিশ্ছিদ্র করে তুললেন। মথুরা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, ব্রজধামের প্রেমময়ী রাধায় রূপান্তরিত হলেন। সমাজবাস্তবতাকে অস্বীকার করার কার্যক্রম সম্পূর্ণ হল।

৮. এর সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি চৈতন্যের আচরণ। রাজ-সংসর্গে তাঁর এই অনীহা কেন? সন্ন্যাসীর আদর্শ অথবা গণমুখী চেতনা (নবদ্বীপ খণ্ডে যা প্রকট ছিল, তারই) অবশেষ? শক্তিশালী হিন্দুরাজার আনুকূল্যে তাঁর মানবমুখী ধর্মসংস্কার একটা ব্যাপক সার্থকতা পেতে পারত—সে সুযোগ কেন নিলেন না চৈতন্য? অথবা নবদ্বীপের সেই গণধর্মের বোধ এখন আর অবশিষ্ট নেই। সেই 'বিপজ্জনক' বোধ আবার জাগ্রত হতে পারে, সম্ভাবনার দরজা খুলতে রাজি ছিলেন না —এমন প্রভাবশালী চৈতন্য-পার্ষদেরা জগন্নাথ-সেবকদের সঙ্গে এক যোগে চৈতন্য-প্রতাপ-রুদ্রের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতায় নানা কৌশলে বাধা দেন নি ত? বিহিসেবী ভাবে ভোলা মহাপ্রভু সামাজিক প্রতিষ্ঠিত রীতি টলিয়ে দিতেও পারেন এই আশঙ্কা কি কোথাও ছিল না?[১] সাক্ষ্য প্রমাণহীন অনুমান করে লাভ নেই। তবে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্য কিছুতেই দেখা করতে চাইলেন না—এই ঘটনাটি চরিতকারেরা যত সহজে রাজ-সংসর্গে খাঁটি সন্ন্যাসীর অনীহা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, অত সরল নয়। এবং একথাও সর্বজনবিদিত স্বরূপ দামোদরের নেতৃত্বে পার্ষদদের কেউ কেউ নীলচলবাসী মহাপ্রভুর চারধারে একটি রক্ষণ-ব্যূহ গড়ে তুলেছিলেন।

৯. ছোট হরিদাসের অপরাধ ও শাস্তির মধ্যেও কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। নারী বিষয়ে চৈতন্যের নিজ আচরণের কথা মনে রাখলেও এই শাস্তিবিধান অসঙ্গত রকম কঠোর মনে হয়। হয়ত চরিতকারেরা যতটা বলেছেন হরিদাস তার চেয়ে অনেক বড় দোষ করেছিলেন। অথবা হরিদাসকে চৈতন্য-নৈকট্য থেকে সরিয়ে

---

১. সম্ভবত রাজার সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগ ঘটানোর উদ্যোগী একটি গোষ্ঠীও ছিল, না হলে ব্যর্থ হয়েও বারংবার ঐ চেষ্টা চলত না।

দেবার অন্য কোনো গূঢ় কারণ ছিল। আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। কিন্তু ঘটনাটি সরল ভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

১০. পুরীতেই কর্মনিবৃত্ত ভক্তি সাধনার মধ্যে তাত্ত্বিকতার ভূমিকা তৈরি হতে থাকে। সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত-বিচার কিংবা রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনায় তার নিদর্শন আছে। চৈতন্য-স্বরূপ তত্ত্বের মূল কথা স্বরূপ দামোদরের রচনায় প্রকাশ পেতে থাকে। শুদ্ধভক্তির পাশে জ্ঞানচর্চা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়—সামাজিক কর্ম না থাকায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তত্ত্বচিন্তা তা পূরণ করে ফেলে।

১১. চৈতন্য নিজে তাঁর অবতারত্ব মানতেন না—কৃষ্ণদাস সেইরূপই লিখেছেন। তাঁকে বিনয়ের আদর্শ রূপে দেখাবার জন্যও তা বলা হতে পারে। তবে রাধাভাবে ভাবিত কৃষ্ণরূপে তাঁকে অনুভব করে স্বরূপ দামোদরের স্তবগান শুনে শুনে তাঁর অনুরূপ বিশ্বাস জন্মানো ও অসম্ভব নয়।

১২. অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় চৈতন্যের ভূমিকা কতটা ছিল বলা কঠিন। সর্বভৌম-বিচারে তাঁর জ্ঞানসাধকের রূপ নৈয়ায়িক তীক্ষ্নতা নিয়ে হয়ত আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাধ্যসাধনতত্ত্ব তাঁর চিন্তার ফল বলে মনে হয় না—বিশেষত যে ভঙ্গিতে রামানন্দ রায়ের মুখ থেকে সব কথাগুলি বের করে আনা হয়েছিল তাতে। সে যা-ই হোক চৈতন্যকে ঘিরে তাত্ত্বিকতার বাতাবরণটি ক্রমেই জটিল ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে থাকে। মৃগীরোগে আক্রান্ত, ভাবে বিভোর এই সন্ন্যাসী অধিকাংশ তত্ত্বেরই আদি সূত্রকার কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, যদিও চরিতকারেরা সেইভাবেই দেখাতে চেয়েছেন।

১৩. বৃন্দাবনে চৈতন্যপন্থী মননশীলদের সমাবেশ ঘটেছিল। বাংলা ছাড়া দূর দক্ষিণ থেকেও কেউ কেউ এসেছিলেন। পুরী বাস কালে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে আকর্ষণী শক্তি দেখেছিলাম তার আরও ব্যাপক নিদর্শন এখানে। চৈতন্য কেন্দ্রীয় সূত্র হিসেবে থাকলেও বৃন্দাবনের বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতেরা দার্শনিকতা আধ্যাত্মিকতার নানা মহলে এমন গভীর ও জটিল সব তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে লাগলেন যা তাঁদের উচ্চস্তরের মনীষার প্রমাণ হয়ে রইল। এরা ভক্তিবাদী বলে পরিচিত, আসলে ভক্তির তত্ত্ব-শাস্ত্রই এঁরা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সমগ্র অনুশীলনই যে জ্ঞানপন্থার তা স্পষ্ট হয়ে আছে। বৃন্দাবনের তত্ত্বকারেরা জনজীবনের সাধারণ স্রোত থেকে বহু দূরবর্তী। এই তত্ত্ববোধ যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বত্র গৃহীত হল তখন দেখা দিল ভক্তির নামে জ্ঞানের প্রাধান্য—অথবা জ্ঞানমার্গের ভক্তিতরল ভাষ্যের অনুবর্তন। সমাজবাস্তবতার সঙ্গে চৈতন্যপন্থা সব সম্পর্ক হারাল।

১.

জ্ঞানশূন্য যে ভক্তি তারও গভীরে গিয়ে সারাৎসারের খোঁজ করেছিল চৈতন্যপন্থা। বাস্তবত 'জ্ঞানশূন্যাভক্তি'র জন্যই একটি বিস্তৃত ও জটিল জ্ঞানকাণ্ড তৈরি হয়ে উঠল। এই বিপুল অসঙ্গতিটা তো চোখে না-পড়ার মতো নয়। জ্ঞান ও ভক্তির সেই অনেক শোনা সমন্বয়ের কথা এখানে আসে না। কারণ 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'কেও 'এহো বাহ্য' বলে বাতিল করেছিলেন চৈতন্য। জ্ঞানের সংশ্রবে ভক্তির শুদ্ধিকে তিনি লঙ্ঘিত হতে দিতে রাজি ছিলেন না। সেই জ্ঞানই কিন্তু শেষপর্যন্ত ওঁদের গোটা ভক্তিবিধিকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

২.

এর ফল বিশ্লেষণের আগে দেখা যাক চৈতন্য-আন্দোলন সেকালের বাংলার জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

চৈতন্য-সমকালীন বাংলায় টোল-চতুষ্পাঠীতে নৈয়ায়িকদের প্রভাব-পতিপত্তি ছিল। বেদান্ত এবং স্মৃতির চর্চা ছিল। অলঙ্কার শাস্ত্রেরও কিছু অনুশীলন হত মনে হয়। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কীর্ণ মহলে এ-সবের সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব। জনসাধারণের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রশ্রয় জুটত। শুধু স্মৃতির বিধান জনজীবন পর্যন্ত ছায়া ফেলত। আর সমাজপ্রধান ও ভূস্বামীদের তরফ থেকে প্রণাম ও সিধে আসত। সামাজিক রীতিনীতি-বিন্যাসের দিক থেকে এই বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট নিরাপদ ছিল, তাদের কূটতর্ক যত তীক্ষ্ণ হোক আসলে তা শব্দের বুদ্বুদ, স্বভাবে নিরীহ। বরং এই লক্ষ্যহীন শাস্ত্রচর্চা বুদ্ধিকে বেঁধে রেখে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে সুস্থির ও নিশ্চিন্ত থাকতে সাহায্যই করত। এবং স্মৃতির বিধি-বিধানকে অলঙ্ঘ্য বলে প্রচার করে বর্ণভিত্তিক ভেদ ও শোষণের কাঠামোকে জীইয়ে রাখার যুক্তি যোগাত। হয়ত নিজেদের এই অর্থ নৈতিক ভূমিকার কথা সকলের স্পষ্ট জানা ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

চৈতন্যপন্থা বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এই অবহেলিত ও সঙ্কীর্ণ অবস্থান থেকে মুক্ত করেছিল। চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব বাংলার ও বাইরের বহু স্থান থেকে আকর্ষণ করেছিল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে। তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানবুদ্ধিকে গুটিয়ে ভক্তিপন্থায় আত্মসমর্পণ করেছিল—আসলে কিন্তু তাঁরা চৈতন্যের ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে একটা দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গ মতবাদ গড়ে তুলল। ক্রমে তার সঙ্গে রসতত্ত্ব ও আচারতত্ত্ব যুক্ত

হল। জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাধনায় তাঁদের ভক্তি হয়ে দাঁড়াল একটি অতি জটিল ভক্তিতত্ত্ব।

নবদ্বীপের প্রধানেরা বৃন্দাবনের এই সব সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। এমন কি বৈষ্ণব কবিরাও তত্ত্ব ও রসপর্যায়ের কথা মনে রেখে পদ রচনায় নিযুক্ত হলেন।

এই সব বিদ্যাচর্চায় বাঙালি পণ্ডিতেরা মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনের নতুন ব্যাখ্যান অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব ভক্তিবাদের ভিত্তি তৈরি করল। রামানন্দ ব্যাখ্যাত সাধ্যসাধন তত্ত্ব বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের হাতে বহুমুখী বিস্তার লাভ করল—প্রেমতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, অবতারবাদ প্রভৃতি এত সব বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বর্গীকরণ করা হয়েছিল যাতে চূড়ান্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। প্রাচীন ভারতীয় রসবাদকে বৈষ্ণবেরা একটি অভিনব নব্য ধারণায় রূপান্তরিত করল। গোটা মধ্যযুগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মননের এ-জাতীয় বিস্ফোরণ-আর ঘটে নি। এবং চৈতন্য এর উৎসে।

কিন্তু এই সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা এক ধরনের বুদ্ধি-বিলাসই। চলমান জীবনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, জনসাধারণের আশাভরসার সঙ্গে তো নেই-ই। সম্ভবত এই নির্বাসিত অবস্থা অনুভব করতে পেরেই পণ্ডিত-মোহান্তরা 'বিনয়' [তৃণাদপি সুনীচেন ইত্যাদি]-এর উপরে গুরুত্ব দিতেন। অনেক উঁচু থেকে বিনয় দেখানো চলে, তাতে বাইরে থেকে মোহবিস্তার হতে পারে, কিন্তু আচণ্ডালের সঙ্গে এক হওয়া যায় না।

প্রথাগত ভাবে অনভিজাত ও তথাকথিত 'নিম্ন' কোটির মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের চৌহদ্দিতে থেকে গেলেও, বৈষ্ণবতা থেকে চুঁইয়ে-পড়া সহজাচরণ বিভিন্ন লৌকিক সহজিয়া আধাবৈষ্ণব গোষ্ঠীর জন্ম দিতে লাগল। এইভাবে নিজ ধর্মীয় প্রথার বাইরে চৈতন্যপন্থার আবেদন নিঃশোষিত হয়ে পড়ল।

এখন চক্ষুষ্মান বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহ্যবিচারেই এর অবস্থান।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তি
ও
বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন—

সা কস্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা।

অর্থাৎ কারোর প্রতি পরম প্রেমের ভাবকেই ভক্তি বলে।

আবার মহর্ষি শাণ্ডিল্য ঈশ্বর ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন—'সা পরানুরাক্তরীশ্বরে।' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরক্তির নামই ভক্তি।

শ্রীরূপ গোস্বামী নারদীয় পঞ্চরাত্র থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বৈষ্ণব ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

সর্বোপাধি বিনির্মুক্তাং ত্বৎ পরত্বেন নির্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সকল প্রকার আসক্তি বা উপাধিবিহীন ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিবর্জিত ঈশ্বরের প্রতি সেবাসক্তিজনিত যে নির্মল অনুরাগ তাকেই ভক্তি বলে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিকেই একমাত্র পথ রূপে নির্দেশ করে বলা হয়েছে—

তৎকর্মজ্ঞানযোগাদি সাধনং দূরতঃ স্থিতং।
সর্বত্র নৈরপেক্ষেণ ভূষিতং দৈন্য মূলকং॥

অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও সাধনার দ্বারা নির্মল প্রেম পাওয়া যায় না। প্রেম সর্বত্র নিরপেক্ষ বলে কেবল দীনতাই এর মূল।

ভাগবতে ভক্তির নবধা লক্ষণের কথা আছে, যথা—

'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা।'

অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ, নামকীর্তন ও স্মরণ, তাঁর পদসেবা, পূজা, বন্দনা, দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন—এইসব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তিকে নবধাভক্তি বলে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় 'ভক্তিযোগ' অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ রুগ্ন, জিজ্ঞাসু, বিষয়কামী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বিধ জনের যে ভজনের কথা বলেছেন তাদের ভক্তি হল হৈতুকী ভক্তি। অপর দিকে অহৈতুকী ভক্তি হল কেবল ভক্তির জন্যে ভক্তি। যেমন বৃন্দাবনের ব্রজগোপীদের ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্মে মূলত অহৈতুকী ভক্তি লক্ষণই ফুটে উঠেছে। শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলিতে রাগভক্তির ভাগবত-ভাবাদর্শ লক্ষণীয়—

॥ ১ ॥ চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের জয় হোক যা চিত্তদর্পণকে মার্জনা করে ভবতাপ নির্বাপণ করে, শ্রেয়োগুণ-জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, যাতে সর্বদা আনন্দ-তরঙ্গ বর্ধিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতআস্বাদন লাভ হয়, যাতে সর্বাত্মার তুষ্টি ও পুষ্টি।

॥ ২ ॥ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ॥

যে নাম স্মরণের কোনো সময় অসময় নেই, বহুপ্রচারিত যে নামের মধ্যে নামী নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, হে ঈশ্বর, তোমার এত কৃপা, অথচ এমনই দুর্দৈব যে এমন নামের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মাল না।

॥ ৩ ॥ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥

তৃণ অপেক্ষা বিনীত, এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হয়ে অমানীকে মানদান করে সর্বদা হরিকীর্তন কর।

॥ ৪ ॥ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মেনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী, কবিতা এসব কিছুই চাই না। হে জগদীশ, তোমার প্রতি যেন আমার জন্ম জন্মান্তরে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

॥ ৫ ॥ অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলি সদৃশং বিচিন্তয় ॥

হে নন্দাত্মজ, তোমার কিঙ্কর বিষম সংসার সমুদ্রে পতিত হয়েছে। কৃপা করে ধূলি-সদৃশজ্ঞানে আমাকে তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও।

॥ ৬ ॥ নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

কবে তোমার নাম গ্রহণে আমার নয়ন হবে অশ্রুধারা বিগলিত, বদন গদ গদ স্বরে রুদ্ধ এবং অঙ্গ পুলকপরিব্যাপ্ত ?

॥ ৭ ॥ যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার এক নিমেষ যুগ বলে মনে হচ্ছে, চক্ষু বর্ষা-সজল হয়ে আসছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে বোধ হচ্ছে।

॥ ৮ ॥ আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাগরঃ ॥

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা পদতলে পেষণ করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে আমাকে মর্মাহত করুন, কিংবা সেই নাগর যেখানে ইচ্ছা গমন করুন, তবু তিনি ছাড়া আর কেউই আমার প্রাণনাথ নন।

প্রেমভক্তি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ স্বরচিত কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না থাকলেও তাঁর নামে প্রচলিত এই শিক্ষাষ্টক শ্লোকগুলির মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন মহিমার কথা। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে নাম ও নামীর অভিন্নতা এবং নাম মহিমার প্রসঙ্গ। তৃতীয় শোকে বৈষ্ণব আচরণ বিধির উল্লেখ প্রসঙ্গে হরিনাম কীর্তনের আবশ্যকতা। চতুর্থ শ্লোকে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা। পঞ্চম শ্লোকে অবিদ্যাক্লিষ্ট জীবের ভগবৎ করুণালাভের কামনা। ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবৎ নাম গ্রহণে সাত্ত্বিক ভাববিকাশের আকাঙ্ক্ষা। সপ্তম শ্লোকে কৃষ্ণ বিরহে সর্বশূন্যতাবোধ। অষ্টম শ্লোকে সর্বাবস্থায় অনুরাগ-বাসনা।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক শ্লোকগুলি যদি প্রকৃতই চৈতন্যদেবের রচনা হয়ে থাকে তাহলে এই শ্লোকগুলি থেকে প্রেমভক্তি সম্পর্কে চৈতন্যমতবাদের তিনটি সূত্র মেলে—

১. নাম ভক্তিবাদ

২. অহৈতুকী ভক্তিবাদ

৩. রাগভক্তি বা প্রেম ভক্তিবাদ

শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলি ছাড়া চৈতন্যচরিতামৃত থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি সম্পর্কিত যে মতবাদগুলি অন্যত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে কালক্রম অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য হল মধ্যলীলার অন্তর্গত রায় রামানন্দ-সংবাদ, রূপের প্রতি চৈতন্যদেবের উপদেশ, এবং সনাতন শিক্ষা। এক্ষেত্রে চৈতন্য মতের গোস্বামী নির্দেশিত উল্লেখ অনুযায়ী প্রথমে প্রেমভক্তি সম্পর্কে রামানন্দ সংবাদ এবং পরে রূপ-সনাতন প্রসঙ্গ আলোচনা করা হচ্ছে।

রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্র শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে আলিঙ্গন করে সাধ্যবস্তু কি জানতে চাইলেন। রায় রামানন্দের উত্তর যেভাবে স্তরে স্তরে অগ্রসর হল তাতে প্রথমে স্বধর্মাচরণে বৈধী ভক্তের কথা, দ্বিতীয়ত শ্রীকৃষ্ণে সর্বকর্ম সমর্পণের কথা এবং তৃতীয়ত স্বধর্মত্যাগ ও কৃষ্ণশরণের কথা বলা হল। অতঃপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিস্তর পেরিয়ে জ্ঞানশূন্য ভক্তিস্তরে এসে রামানন্দ যখন উপস্থিত হলেন তখন তা শ্রীচৈতন্যের সমর্থন পেল। এর আগে পর্যন্ত ভক্তিস্তরের প্রসঙ্গগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের মনের কাছাকাছি আসতে পারছিল না। অতঃপর প্রেমভক্তির অন্তর্গত দাস্য প্রেম, সখ্য প্রেম, বাৎসল্য প্রেমের স্তর পেরিয়ে মধুরা ভক্তি বা কান্তা প্রেমকেই সর্ব সাধ্যসার বলা হল। এই কান্তা প্রেমের রাগমার্গ সাধনার চরম অবস্থা প্রেমবিলাস বিবর্তের মধ্যে। রাধাই এই প্রেমের 'সাধ্য শিরোমণি'। জীব এই স্তরে যেতে পারে না, রাগানুগা ভক্তিতেই তার অধিকার।

রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেবের এই ভক্তিতত্ত্বালোচনার মূল সূত্রগুলি পাওয়া যাবে রূপের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিতত্ত্বের পুনরালোচনায়। আগের আলোচনায় রামানন্দ বক্তা এবং শ্রীচৈতন্যদেব শ্রোতা। এক্ষেত্রে রূপ শ্রোতা এবং শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশদাতা। ভক্তিকে মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে ভাগ করে মুখ্যা ভক্তির ক্রমোৎকর্ষ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গুণাধিক্যে ও স্বাদাধিক্যে মাধুর্য ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা করেছেন। তবে রায় রামানন্দের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় শান্তভক্তির কোনো উল্লেখ ছিল না, সেখানে দাস্যভক্তি থেকে শুদ্ধাভক্তির আরম্ভ ; কিন্তু রূপের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের মধ্যে শান্তভক্তিরও উল্লেখ আছে। ভক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থার কথা ভেবে রায় রামানন্দ যার উল্লেখ

করেন নি। ভক্তের নিষ্ঠাগুণের কথা ভেবে শ্রীচৈতন্যদেব শান্ত ভক্তিকে উপেক্ষা করেন নি। রূপ গোস্বামীকে ভক্তিরসতত্ত্বের শিক্ষা দিতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থরূপে যে নিষ্কামভক্তির কথা বলেছেন তা শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গত অহৈতুকী ভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। তবে প্রেমের ক্রমোৎকর্ষ বিচারে শ্রীচৈতন্যের মুখে স্নেহ-প্রেম-মান-প্রণয়-অনুরাগ-ভাব ও মহাভাবের যে স্তরবিন্যাস করা হয়েছে তা কতটা চৈতন্য মতবাদ আর কতখানি রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণের অন্তর্গত গোস্বামী সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ বাণীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ভক্তিরসের আলঙ্কারিক প্রকারভেদের দিক, আর সনাতন শিক্ষার মধ্যে আছে ভক্তির আচরণ-বিধি প্রসঙ্গ। রূপের মন-প্রকৃতি ছিল প্রধানত কবি ও কাব্য রসিকের আর সনাতনের মানস প্রকৃতি ছিল স্মার্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রকারের। রূপ গোস্বামী লিখেছিলেন কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার শাস্ত্র, আর সনাতন লিখেছিলেন ভাগবতের টীকা এবং স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস'। শ্রীচৈতন্যদেবের লোকচরিত্রজ্ঞান ছিল অসামান্য। রূপের কবি প্রকৃতি বুঝে তাঁকে দিয়েছিলেন ভক্তিরস শাস্ত্র সম্পর্কিত উপদেশ আর সনাতনের মনঃপ্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে দিয়েছিলেন ভক্তির সাধন ও আচার আচরণ সম্পর্কিত পথ নির্দেশ। রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে ভক্তিরস সম্পর্কিত যে সিদ্ধান্তগুলি অর্জিত হল শ্রীচৈতন্যদেব সেগুলি শেখালেন রূপকে আর সাধ্য সাধন ভক্তি সম্পর্কিত আচরণ বিধির সূত্রগুলি দিয়ে গেলেন সনাতনকে। শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে রূপ শিখলেন শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি পঞ্চরস পর্যায়ের জ্ঞান এবং প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাবের ভাবাদর্শগুলি, আর সনাতন শিখলেন সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের দার্শনিক ভাবনা প্রসঙ্গে বৈধীভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি-রাগানুগা ভক্তির আচরণ বিধি।

'সনাতন-শিক্ষা' অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য বললেন জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞান ভক্তির মধ্যেই সর্বাধিক পরিস্ফুট। ভক্তিই জীবকে ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং ভগবদ্দর্শন করাতে পারে। ভগবানও ভক্তির অধীভূত। জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ ও অন্যান্য মার্গে এই সম্পূর্ণতা নেই, ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধজ্ঞানের এমন পরিপূর্ণ বিকাশও অন্য কোনো মার্গে সম্ভব নয়। সুতরাং সবদিক থেকে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাও লাভ করা যায়; অতএব 'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান'। কৃষ্ণভক্তি সাধনায় আবার তিনটি শ্রেণী—যথা বৈধীভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি।

মহাপ্রভু বৈধীভক্তির ব্যাখ্যা করে সনাতনকে বললেন—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥

ভগবানে যার অনুরাগ নেই এমন ব্যক্তিও অনেক সময় নিতান্ত শাস্ত্রের আজ্ঞ বিধিমার্গে ঈশ্বর ভজনা করে। এর নাম স্বধর্মাচরণ। এই স্বধর্মাচরণ থেকে কালক্র ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মাতে পারে ;—এই বিধি বা নিয়ম পালনমুখী যে ভক্তি ে আচার মার্গীয় ভক্তির নাম বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি আবার দুই প্রকারের। সক বৈধীভক্তি এবং নিষ্কাম বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তিতে সকাম সাধনা অপেক্ষা নিষ্কাম সাধ মহত্তর, কারণ সকামে ফলস্পৃহচিত্ত থাকে বহির্মুখী, নিষ্কামে তা অন্তর্মুখী। সনা বৈধীভক্তি শিক্ষাদানকালে শ্রীচৈতন্যদেব নামসঙ্কীর্তন-প্রধান গ্রহণাত্মক, বর্জনাত্ম রসাত্মক এবং উন্মেষাত্মক চৌষট্টি অঙ্গ সাধনার উপদেশ দিয়েছেন। বৈধীভক্তির অনুষ্ঠ করতে করতে কখনও কখনও ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসম্পর্কে ভক্তের চিত্ত থেকে ঐশ্বর্যজ্ঞ অন্তর্হিত হয়ে শুদ্ধাভক্তির উদ্ভবের ফলে কৃষ্ণ সেবার লোভ জন্মাতে পারে—এ অবস্থ সাধকের ভক্তি প্রেম-ভক্তিতে পর্যবসিত হয়।

প্রেমভক্তির অন্তর্গত রাগাত্মিকা ভক্তির সংজ্ঞায় মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছেন 'রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম।' ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নামই রাগ ; সেই রাগ বা অনুরাগময়ী যে ভক্তি তাই হল রাগাত্মিকা ভক্তি। নিত্য ব্রজধামে সু ইত্যাদি সখা, নন্দযশোদা এবং রাধা ও তাঁর নিত্য সখীস্থানীয়া গোপীবৃন্দের শ্রীকৃ প্রতি যে অনুরাগময়ী সেবা সেই ভক্তিকেই রাগাত্মিক বলা হয়। এই স্বাতন্ত্র্য রাগাত্মিকা ভক্তিতে জীবের কোনো অধিকার নেই ; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশ যাঁ এই ভক্তিতে একমাত্র তাঁদেরই অধিকার। জীব তটস্থা শক্তির অন্তর্গত বলে রাগাত্মিকা ভক্তিতে তার অধিকার নেই। সখীদের মধ্যে ললিতা প্রমুখ যাঁরা স্ব শক্তির অন্তর্গত নিত্য সখী তাঁরা রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী, কৃষ্ণ সুখের জন্যে তঁ নিজেরা সজ্জাবিলাস করে থাকেন এমনকি দেহদানও করতে পারেন। কিন্তু সাধন-‍ সখী যাঁরা তাঁরা নিত্যসখীদের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাসে সহায়ক ম প্রত্যক্ষ লীলায় যোগ দিতে পারেন না, এই অনুগত সখীদের একান্ত আনুগত্য সেবার অনুসরণেই রাগানুগা ভক্তির উদ্ভব।

চৈতন্যচরিতামৃতে রাগানুগা ভক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব সনাত রাগাত্মিকা ভক্তির সঙ্গে রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে ॥

রাগাত্মিকা ভক্তির ক্ষেত্রে ব্রজপরিকরদের যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার কথা বলা হয়েছে তা প্রাকৃত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। জীব স্বরূপত কৃষ্ণের দাস। আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের একমাত্র অধিকার। সুতরাং নন্দ-যশোদা এবং ব্রজগোপীদের আনুগত্যে—তাঁদের রাগাত্মিকা সেবার আনুকূল্য বিধানরূপ সেবাকেই বলে রাগানুগা সাধনা। রাগানুগা সাধনা আবার প্রকৃতিভেদে দ্বিবিধ—বাহ্য সাধন ও আন্তর সাধন। বাহ্য সাধন হল ভাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন ইত্যাদি নবধা ভক্তি-আচরণ। আর আন্তর সাধন হল সখীভাবের অনুগত হয়ে হৃদয় বৃন্দাবনে নিজের সিদ্ধ প্রকৃতিদেহ চিন্তা করে স্বীয় ভাবানুগ পরিকর বর্গের অনুগত্যে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করা। এই আন্তর সাধনকেই মঞ্জরী সাধনা বলে।

এখন প্রশ্ন, প্রেমভক্তি সম্পর্কে 'সনাতন-শিক্ষা' নামে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমুখে যে উপদেশ বাণী বিধৃত হয়েছে তা কি সত্য চৈতন্য মতবাদ অথবা পরবর্তী কালের গোস্বামী মতবাদের প্রক্ষেপ। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে ছিলেন রাগাত্মিক ভক্তি পথের পথিক। বৈধীভক্তির চেয়ে রাগাত্মিক ভক্তিকে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে তিনি যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন চৈতন্যভাগবতে তার প্রমাণ আছে। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি শঙ্করের অদ্বৈতমত সমর্থন করতেন না, তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত উভয় গ্রন্থেই আছে। অদ্বৈত আচার্য একদা অদ্বৈতমত শিক্ষা দিচ্ছিলেন বলে গৌরাঙ্গ তাকে পিঁড়ি থেকে উঠোনে নিয়ে এসে কিলোতে আরম্ভ করেন বলে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বিতর্কে তাঁর অদ্বৈত মত খণ্ডনের যে বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত, তা তাঁর পূর্বোক্ত আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। নাম ভক্তিবাদ এবং অহৈতুকী ভক্তি সম্পর্কিত মতবাদও চৈতন্য-কথিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কিন্তু রাগানুগা ভক্তি সাধনা ও মঞ্জরী সাধনা সম্পর্কিত মতবাদের কোনো উল্লেখ যেমন শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক শ্লোকের মধ্যে নেই, তেমনি চৈতন্য জীবনী সম্পর্কিত প্রমাণ্য গ্রন্থ চৈতন্যভাগবতে মেলে না। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তি সাধানার ক্ষেত্রে সকলকে সমানাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। রাগাত্মিকা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি সাধনার এই অধিকার ভেদে সাম্যবাদী চৈতন্যমনোদর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। রাগানুগাতত্ত্ব রূপ গোস্বামীর অবদান বলেই সন্দেহ হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি সম্পর্কিত মতের সঙ্গে ভারতীয় ভক্তিবাদের সম্পর্ক অনুধাবন করতে গেলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে শ্রীচৈতন্যের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। শ্রীচৈতন্যদেব যে সময় এদেশে আবির্ভাব হয়েছিলেন সেই সময় ভারতীয় ভক্তিসাধনার-স্বর্ণযুগ.। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত জুড়ে ভক্তি ভাবের যে আন্দোলন ষোড়শ শতকের আগের থেকেই দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে নামদেব রামানন্দ কবীর সকলেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব এই সব ভক্তি সাধকদের মতের সঙ্গে চৈতন্যমতের আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যই বেশী। দক্ষিণ ভারত থেকে যে ভক্তিবাদ নিয়ে নামদেব ও রামানন্দ উত্তর ভারতে আগমন করলেন দক্ষিণ ভারত পরিক্রমাকালে সেই ভক্তিবাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিষ্ণু লক্ষ্মী—উপাসনার ঐশ্বর্যভক্তির চেয়ে রাধাকৃষ্ণ ভজনার মাধুর্যভক্তিই শ্রীচৈতন্যদেবকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। দাক্ষিণাত্যের শ্রীউপাসক রামানুজপন্থীদের চেয়ে উত্তর ভারতের বল্লভী সম্প্রদায়ের মাধুর্যবাদী ধ্যান ধারণার সঙ্গে তাঁর যোগ বেশী। আবার নামদেব, রামানন্দ ও কবীরের মধ্যে নামদেবের অহৈতুকী ভক্তি ও কীর্তনাদর্শের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার সাদৃশ্য যতখানি, রামানন্দ ও তাঁর শিষ্য কবীরের নির্গুণ ভক্তিবাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সগুন ভক্তিবাদের যোগ ততখানি নয়। সময়কালের দূরত্বের জন্যে নামদেব ও রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভব ছিল না। কবীর সম্ভবত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু উত্তরাপথ পরিক্রমাকালে কবীরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ চৈতন্য-চরিতগ্রন্থে নেই। তবে কবীরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শের মিল খুবই কম। কবীর ছিলেন গৃহী সাধক। সংসার জীবনের কর্ম সাধনায় অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি ছিলেন ভগবন্মুখী। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তির প্রবল টানে সংসার জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপনা কর্ম ত্যাগ করে তিনি জ্ঞানব্রতের পরিবর্তে ভক্তিব্রত নিয়েছিলেন, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পরিবর্তে ভক্তিযোগই তাঁর আদর্শ হয়েছিল। তিনি নামসঙ্কীর্তনের ভক্তি সুধা পান করে যেভাবে ভাবোন্মত্ত হতেন কবীরের শান্ত ভক্তি তার থেকে অনেকখানি দূরবর্তী। শ্রীচৈতন্যদেব পরিব্রাজকে রূপে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমাকালে বহু মনীষী ও সাধককে যে প্রভাবিত করেছিলেন চরিতামৃতে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। কিন্তু প্রেমভক্তির চেতনার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব কার কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটা ভেবে দেখার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতের

ভক্তিধর্ম মাধবেন্দ্র পুরী এবং ঈশ্বর পুরীর মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যচিত্তে সঞ্চারিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য অনুযায়ী নামভক্তিবাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীবরের ভগবন্নাম-কৌমুদী শ্রীচৈতন্যদেবের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকতেও পারে। শ্রীমদ্-ভাগবতের নবধাভক্তির উল্লেখ—যথা, শ্রাবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন ইত্যাদি নয় প্রকার ভক্তিভাবের আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরকীয়া প্রেমের ভক্তি-মাহাত্ম্য তিনি শ্রীমদভাগবত থেকেই অর্জন করেছিলেন। ভাগবত গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীধর স্বামীর টীকা 'ভাবার্থ দীপিকা'র মধ্যে দিয়ে। ভাবার্থ দীপিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করবেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেছিলেন। তিনি শ্রীধর স্বামীর ভাগবত ভাষ্যকে অত্যন্ত মান্য করতেন এবং স্বামীকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন শ্রীধর স্বামী এই টীকায় জীবের নিত্যতা, জগতের সত্যতা এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলে খণ্ডন করেছেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাতেও তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেছিলেন। বল্লভভট্ট নামে একজন ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যকে উপেক্ষা করে নতুন ভাষ্য রচনা করায় শ্রীচৈতন্যদেব সেই স্বামী-পরিত্যাগিনী ভাষ্য শুনতেও অস্বীকার করেন। সুতরাং 'ভাবার্থ দীপিকা' শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি কিছু কিছু বৈষ্ণবীয় পুরাণও তাঁর প্রেমভক্তি সম্পর্কিত মতাদর্শকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। চৈতন্যচরিতা-মৃতে চৈতন্যমুখে যতসংখ্যক শ্লোক বসানো হয়েছে তার কিছু কিছু নিশ্চয় শ্রীচৈতন্য-দেবের অধিগত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং দক্ষিণ ভারত থেকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের পুঁথি নিয়ে আসেন। গ্রন্থদ্বয় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ প্রিয় ছিল—ব্রহ্মসংহিতার ভগবৎ-তত্ত্ব এববং বিল্বমঙ্গলের ভক্তিবাদ শ্রীচৈতন্যদেবকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। উপনিষদ ও গীতাকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিবাদের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও বড় কম নয়। তিনি ছিলেন রাগাত্মিকা ভক্তি পথের পথিক। তাঁর পথ ছিল ভাবাবেগের পথ—সে পথের দিশারী ছিলেন জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ, বিল্বমঙ্গল, মালাধর বসু প্রমুখ কবিবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। মালাধর বসুর প্রতি তিনি এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে কুলীন গ্রামের কুকুরকেও তিনি প্রিয় মনে করতেন। সমসাময়িকদের মধ্যে রায় রামানন্দের কাছে তাঁর কিছু ঋণ ছিল বলে মনে হয়। স্বয়ং মধুর ভাবের সাধক হয়েও শ্রীচৈতন্যদেব রূপ গোস্বামীকে যে পঞ্চভক্তিরসের

শিক্ষা দিয়েছেন এই আদর্শ সম্ভবত রায় রামানন্দের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। এছাড়া গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর থেকে অর্জন করেছিলেন মাধুর্যরসের আদর্শ।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বোক্ত প্রেম ভক্তির আদর্শই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব রূপে কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে তা দেখা যেতে পারে—

১। জ্ঞান ও কর্ম অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

২। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের চেয়ে পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তিই কাম্য।

৩। হৈতুকী বা সকাম ভক্তি নয়, অহৈতুকী বা নিষ্কাম ভক্তিই উৎকৃষ্ট।

৪। বৈধীভক্তি ভক্তিলাভের অন্যতম উপায় হলেও রাগভক্তি মুখ্যাভক্তি, রাগানুগাভক্তি সম্ভবত চৈতন্যমত নয়।

৫। ঐশ্বর্যভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তিতে ভক্ত ভগবানের মধ্যে সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ববোধ থাকে সেই ভক্তি কখনই আদর্শ ভক্তি নয়, মাধুর্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তিপথ।

৬। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের মধ্যে মধুররসই শ্রেষ্ঠ—অন্যান্য রসের সাধনা চৈতন্য জীবনে মূর্ত হতে দেখা যায় না।

৭। রাগভক্তির ক্ষেত্রে ভাগবতোক্ত পরকীয়া নায়িকার সর্ববন্ধনছেদী ভক্তি-ব্যাকুলতাকেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তির আদর্শ বলে মনে করতেন—তাঁর জীবনেও সেই ব্যাকুলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

৮। নামভক্তিকে ভক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে তিনি মনে করতেন।

৯। শঙ্করের অদ্বৈত মতবাদে শ্রীচৈতন্যদেবের আস্থা ছিল না। ভক্তিবাদী বলেই তিনি ছিলেন মূলত দ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ কতোটা চৈতন্যমত আর কতোটা গোস্বামী দার্শনিকদের মতবাদ তাতে বিতর্কের অবকাশ আছে।

১০। প্রেমভক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই তিনি প্রেমভক্তি দানের পক্ষপাতী। কৃষ্ণ তাঁর মুখ্য উপাস্য হলেও অন্য দেবদেবীকেও তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম অবশ্য নানাকারণে সাম্প্রদায়িক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হয় এবং চৈতন্য মতাদর্শ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়ে—সন্দেহ নেই।

চৈতন্য-পরিক্রমা

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১.

চৈতন্যের পাঁচটি নাম। গৃহস্থাশ্রমে চারটি—বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌরচন্দ্র ও গৌরাঙ্গ এবং সন্ন্যাস নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। চৈতন্য ভাগবতে এই পাঁচটি নামেরই উল্লেখ আছে।

ক. জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥

খ. ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই ॥

গ. গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥

ঘ. আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।

ঙ. শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম তবে পরকাশ ॥

চৈতন্য ছাড়া কোনো বাঙালীর কি পাঁচটি নাম আছে? রূপে, মেধায়, তেজস্বিতায়, সঙ্গীত-প্রিয়তায়, অপূর্ব সন্ন্যাসী ব্রতে ও স্বল্প আয়ু ভাগ্যে চৈতন্যের সমতুল বাঙালী বিবেকানন্দের তিনটি নাম। এ বিষয়ে বাঙালীর মধ্যে চৈতন্য একক ও অদ্বিতীয়। চৈতন্য সন্ন্যাস-নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তারপর নিমাই নামে এবং তারপর গৌরাঙ্গ -নামে। চৈতন্যের গৃহী জীবনের ভালো নাম বিশ্বম্ভর। কিন্তু এ-নামে তিনি বিশেষ

খ্যাত নন। চৈতন্য ভাগবতকার বিশ্বম্ভর নামটির যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু ভণিতায় এ-নামটি উহ্য রেখে বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-নামকেই স্মরণ করেছেন।—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-নামের প্রসিদ্ধি দেখে মনে হয় বাঙালী সন্ন্যাস-বিলাসী, জীবন-বিলাসী নয়। কিন্তু চৈতন্যের যে জীবনাচরণ তাতে তাঁকে সন্ন্যাস-বিলাসী না বলে জীবন-বিলাসী বলাই ভালো। কিন্তু কী এ-জীবন? ভক্তেরা চৈতন্যকে প্রচার করলেন ঈশ্বর বলে। এতে চৈতন্যের মন সায় দেয় নি। তাঁকে বললেন পরম সন্ন্যাসী। চৈতন্য তা মানেন নি। তাঁর আচরণেও তথাকথিত সন্ন্যাসী লক্ষণ কম। তিনি গুরু নন, কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দেন নি। তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যবন হরিদাস তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে তুলে নৃত্য করতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি পণ্ডিত, এ বিষয়ে তাঁর অহঙ্কার ছিল। তিনি প্রেমিক, নিজের ভাল-লাগা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি খেতে ভালবাসতেন শাক, আম, লাউয়ের তরকারি। তাম্বূল চর্বণ করতেন। লোককে রাগাতে ভালবাসতেন। নৃত্যগীতে প্রবল আসক্তি। অভিনয়ও ভালবাসতেন। সুন্দরের প্রতি সহজ আকর্ষণ ছিল। কর্তব্যকর্মে ছিলেন কঠোর। বৈরাগ্য নিলেও জননী ও জাহ্নবীর প্রতি ছিল তীব্র আকর্ষণ; আসলে চৈতন্য ছিলেন একজন 'কমপ্লিট ম্যান'। তাঁর জীবনের শেষ ক'বছর অবশ্য ব্যাখ্যার উর্ধ্বে।

২.

বাংলায় লেখা চৈতন্য জীবন-কথার আকর-গ্রন্থ দুটি—বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে যে ভনিতা দিয়েছেন তাতে তাঁর গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নি। কৃষ্ণদাস করেছেন--

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম যে 'চৈতন্যমঙ্গল' তা জানতে পারি কৃষ্ণদাসের লেখা থেকে। বৃন্দাবন দাস নিজের গ্রন্থ সম্পর্কে কি বলেছেন তা দেখা যাক। চৈতন্য-ভাগবতের শুরুতে চৈতন্য-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখছেন—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

চৈতন্য-চরিত স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বসে শেষের জিহ্বায় ॥
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন-চরিত।
ভক্তপ্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত ॥
বেদ-গুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥

* * *

মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈল যথা তথা ॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম ॥

বৃন্দাবন দাস দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে গ্রন্থ রচনার কারণের কথা বললেন, বিষয়ের কথা বললেন, খণ্ড বিভাগ করলেন, কিন্তু আপন গ্রন্থের নাম কি তা বললেন না। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখ করেন নি তাঁকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলেছেন। প্রধানত এই সূত্র ধরেই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'চৈতন্য-ভাগবত'। কিন্তু প্রশ্ন এই : কৃষ্ণদাসই কি বৃন্দাবনকে ব্যাস-রূপে প্রথম প্রচার করেছেন ? আজ পর্যন্ত তাই ধারণা। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবন দাস তো নিজেই ব্যাস-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং নিজেকে ব্যাস-রূপে কল্পনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি।

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র ॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্ব জীব উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস ॥
মধ্যখণ্ডে আর কত কত কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা ॥

অন্যত্র—

শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু বড় মোর ভাগ্য ॥
এই মত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥

এই বেদব্যাস কে? অবশ্যই বৃন্দাবন দাস। পিতৃ-পরিচয়-হীন বৃন্দাবন মায়ের নামোল্লেখ করে নিজেকে ব্যাস কল্পনা করেছেন। তাই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-চরিত গ্রন্থে 'চৈতন্য-ভাগবত' নামকরণের উৎস আছে। তার জন্যে কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। তবে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নামকরণ যে 'চৈতন্য-ভাগবত' হয়েছিল তা অবশ্যই চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার পরে।

চৈতন্য-ভাগবতে রচনাকাল দেওয়া নেই। নানা সূত্র ধরে গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ণয় করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন চৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল ১৫৪১—১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। চৈতন্য-ভাগবতের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত দুটি ছত্র ধরে চৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। এই দুটি ছত্র সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ছত্র দুটি উদ্ধারের আগে প্রাসঙ্গিক কথা বলি। চৈতন্যের কথামতো নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম কীর্তন করে বেড়াতেন। পথে একদিন তাঁরা নবদ্বীপের দুই গুণ্ডা জগাই ও মাধাইয়ের সামনে পড়েন। নিত্যানন্দ এই দুই ভাইকে হরিনাম-উপদেশ দিতে গিয়ে মারধোর খান। ঘটনাটা চৈতন্যের কানে পৌঁছয়। তিনি প্রবল ক্রুদ্ধ হয়ে জগাই-মাধাইয়ের কাছে ছুটে আসেন। চৈতন্যকে দেখে জগাই মাধাইয়ের মতি ফেরে। তারা গুণ্ডামি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব ভিখারীর মত জীবন কাটাতে থাকেন। চৈতন্যের পরামর্শে তারা জনসাধারণের স্নানের সুবিধার জন্য নিজে খেটে গঙ্গায় এক ঘাট বেঁধে দিয়েছিল। চৈতন্য-মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করে লিখেছেন—

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
মাধাই-এর ঘাট বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥

মাধাই-নির্মিত নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট বৃন্দাবন দাসের সময় 'মাধাই-এর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ। জগাই মাধাই উদ্ধার ঘটনাটি ঘটে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের অল্প কিছু আগে। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'মাধাই-এর ঘাট' বিশেষ প্রসিদ্ধ, তবে ঘাটের অবস্থা শোচনীয়—'অদ্যাপিহ চিহ্ন

আছে।' কোন ঘাটের বিশেষ প্রসিদ্ধি দাঁড়াতে এবং সামান্য চিহ্নটুকু টিঁকে থাকতে তিরিশ-চল্লিশ বছর লাগবে। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে তিনি ঘাটের জীর্ণ রূপ দেখেছেন। নইলে 'অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে'—একথা বলতেন না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার কাল ১৫৪০—১৫৫০-এর মধ্যে। তাই চৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনুমান অনেকখানি ঠিক।

৩.

আগেই বলেছি চৈতন্য বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-নাম ; কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী নন। চৈতন্য-ভাগবতে আছে—

প্রভু বোলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু তাঁর চিন্তায় আচরণে আমরা কর্তব্য-পরায়ণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই পরিচয় পাই। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমী, তাঁর বাইরের রূপ সন্ন্যাসীর ; কিন্তু তিনি আচরণ সর্বস্ব, তত্ত্বমুখীন নন। তাঁর বিদ্যা-জ্ঞান, পরিশীলিত মন, রসবোধ, সর্বজীবে ভালবাসা, সাহিত্য-সঙ্গীতানুরাগ তাঁকে সন্ন্যাসীর বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত করে বিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে-জীবন ক্ষেত্রে রাজা-জমিদার, পণ্ডিত ও ভক্তিমার্গের পথিক, ধনী ও ভিখারী, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান, যুবক-বৃদ্ধ-বালক, মা ও মাতৃজাতি, বিষয়ী ও সন্ন্যাসী সব একাকার। চৈতন্যের জীবন মনুষ্য-সান্নিধ্যে পরিব্যাপ্ত, পরিভ্রমণে সমৃদ্ধ, ভক্তিরসে আপ্লুত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য মোটামুটিভাবে নীলাচলে স্থায়ী হয়েছিলেন। মাঝে গৌড় ভ্রমণও করেছেন। পুরীতে থাকাকালীন গৌড়ের ভক্তরা প্রতি বছর পুরী যেতেন এবং চৈতন্য-সান্নিধ্যে দু'চার মাস কাটিয়ে আবার গৌড়ে ফিরে আসতেন। তাই চৈতন্য জন্মভূমি ত্যাগ করলেও গৌড় ও গৌড়বাসীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ অটুট ছিল। এই সংযোগের পথেই চৈতন্য-মহিমা ব্যাপ্ত হয়েছিল।

চৈতন্য ঈশ্বরপ্রেমী ; কিন্তু মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর স্বভাবজ। পুরীতে শশী

মিশ্রের নির্জন বাগান বাড়ীতে চৈতন্য বাস করতেন। হরিদাসও পুরীতে। 'মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।' চৈতন্যকে দেখে হরিদাসের আনন্দের সীমা নেই। কৃষ্ণদাস লিখেছেন।

প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবত হৈঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইঞা॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥

চৈতন্যের এই পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও মানসিক উদারতা মধ্যযুগে বাঙালীর নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এরই প্রতিফলন। চৈতন্যের শিক্ষা ছিল 'আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবা।' ধর্মের গোঁড়ামি বা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উদ্যত খড়্গ চৈতন্যকে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সুবুদ্ধি রায় আগে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। হোসেন খাঁ ছিলেন তাঁর কর্মচারী। কাজের গাফলতির জন্য সুবুদ্ধি রায় হোসেন খাঁকে একবার চাবুক মেরেছিলেন। হোসেন খাঁর পিঠে সেই চাবুকের দাগ পড়ে গিয়েছিল। হোসেন খাঁ পরে সিংহাসন অধিকার করে সুলতান হয়েছিলেন, নাম হোসেন শাহ। একদিন হোসেন শাহর বেগম সেই চাবুকের দাগ দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা জেনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুবুদ্ধি রায়কে চরম শাস্তি দিতে অনুরোধ করতে থাকে। হোসেন শাহ প্রথমে এ কথায় রাজি হল না। পয়ে স্ত্রীর জেদে সামান্য শাস্তি দেন। সুবুদ্ধি রায়ের মুখে সুলতানের বদনার জল ঢেলে দেওয়া হোল। সুবুদ্ধি রায় নিজেকে জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত মনে করে গৃহত্যাগ করলেন এবং কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে বিধান চাইলেন। আদেশ হোল তপ্ত ঘৃত খেয়ে সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণত্যাগ করতে হবে। মনের এরকম অবস্থায় চৈতন্যের সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের দেখা। সব কথা শুনে চৈতন্য তাঁকে প্রাণ ত্যাগ থেকে বিরত করলেন।

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন॥

সেই সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবন দেখে মথুরায় এসে কিভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃতে।

রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পৈসা পায় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবাইঞা।
আর পৈসা বাণ্যার স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দন॥

এভাবে গৌড়ের প্রাক্তন অধিকারীকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শুষ্ক শাস্ত্র ব্যাখার হাত থেকে বাঁচিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় চৈতন্যের আগে ও পরে আর কে লাগিয়েছেন? এই হোল চৈতন্যের কর্তব্য ও ভালবাসা।

সপ্তগ্রামের ধনী ব্যক্তি গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস নীলাচলে চৈতন্যের টানে চলে যান। রঘুনাথ প্রচণ্ড ধনী; বিষয়ী মানুষ। এই রঘুনাথকে চৈতন্য উপদেশ দিয়েছিলেন—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে রঘু ভাল না পরিবে॥

শুধু তাই নয়। আরও বলেছিলেন,

মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা॥

পুরীতে রঘুনাথ চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। চৈতন্য খেতেন কিন্তু মন প্রসন্ন হোত না। কেননা, 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।' রঘু তা বুঝতে পেরে চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছেড়ে দিয়ে সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন কাটাতেন। পরে তাও ত্যাগ করলেন। শুনে

প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যা ব্যবহার॥

এখানে চৈতন্যের আচরণ ও শব্দ প্রয়োগ কি কৃষ্ণপ্রেমী সন্ন্যাসীর মতো, না প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো? চৈতন্যের চরিত্র কঠোরে কোমলে গঠিত। ছোট হরিদাস বর্জন কাহিনী এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

চৈতন্যের কর্মচর্যার ক্ষেত্রভূমি ছিল প্রধানত তিনটি—গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশ, নীলাচল ও বৃন্দাবন। এছাড়া দাক্ষিণাত্য ও আসামকে খানিকটা অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতের একটা বিরাট ভূখণ্ড মধ্যযুগে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল চৈতন্যের দ্বারা। চৈতন্যের কোন্ শক্তি একাজে সহায়ক হয়েছিল? আমরা জানি, মধ্যযুগে ধর্ম ছিল আমাদের দেশে সংহতির অন্যতম ভিত্তি। তাহলে চৈতন্য-ধর্ম তথা বৈষ্ণবধর্ম কি এই বিরাট ভূখণ্ডকে এক জায়গায় বেঁধেছিল? আপাতদৃষ্টিতে তাই। কিন্তু চৈতন্য তো বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব নিয়েই জীবন কাটান নি। যাঁরা তাঁর চারপাশে ছিলেন তাঁরাও তো প্রধানত ধর্মবেত্তা নন। তাঁরা ভক্ত। কিসের ভক্ত? চৈতন্য-সংস্কৃতির ভক্ত। চৈতন্যের জীবনে দুটি স্রোত আগাগোড়া প্রবহমান। একটি বিদ্যাচর্চা-সাহিত্যচর্চার ধারা, অপরটি নৃত্যসঙ্গীত-চর্চার ধারা। সংস্কৃতির এই দুই প্রধান অঙ্গ মধ্যযুগে জাতীয় সংহতি রচনার বিশেষ ভূমি প্রস্তুত করেছিল। এই সংস্কৃতির পথেই চৈতন্য অনেককে এক জায়গায় এনেছিলেন; খানিকটা ঐক্যবিধান করেছিলেন। জাতীয় ঐক্যের প্রধান শর্ত হোল দেশের মানুষদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও মেলবন্ধন। দেশের মানুষের প্রতি চৈতন্যের ও চৈতন্য-পথিকদের ভালবাসার অন্ত ছিল না। চৈতন্য গভীর ভালবাসায় বলেছেন,

কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥

চৈতন্য ছিলেন ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু সাহিত্যরসে তিনি মশগুল থাকতেন। শৃঙ্গার রসাত্মক গীতিকবিতার পদ তাঁর মনকে টানতো। তিনি তা আওড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আসলে তিনি ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। তাঁর আনন্দ সত্তা ছিল। শেষ জীবনেও চৈতন্য কবিতা রস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন নি। অথচ চৈতন্যের শেষ জীবন—'প্রেমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।' এ জীবন সর্বত্র বোধ্য নয়, ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ জীবনেও চৈতন্য সাহিত্যরস এবং সঙ্গীত নৃত্য থেকে নিজেকে ও অপরকে বঞ্চিত রাখেন নি। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের শেষ দিক থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েক ছত্র উদ্ধার করি।

ছয় ঋতুগণ যাহাঁ বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান॥

ললিত লবঙ্গলতা পদ গাওইঞা।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লৈঞা ॥

অন্ত্যখণ্ডের শেষ অধ্যায়ে কৃষ্ণবিরহী চৈতন্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস লিখেছেন,

স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে ॥

* * *

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িঞা।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লৈঞা ॥

সাহিত্যচর্চা, কীর্তন ও সংকীর্তন, নৃত্য-অভিনয়, বৈষ্ণব মিলন ("মোচ্ছব"), সকল জীবে ভালবাসা—এই হোল চৈতন্য-সংস্কৃতির মূল কথা। এই পথেই চৈতন্য দেশকে জাগিয়েছিলেন, দেশের মানুষের চিত্তের বিস্তার ঘটেছিল। চৈতন্যের এই কীর্তি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চৈতন্যের বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব তাঁকে ঈশ্বর পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। তাই চৈতান্যাচরণ সে যুগে চৈতন্যলীলায় পরিণত হয়েছিল। এ লীলার একটা তাত্ত্বিক রূপ ছিল। গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও দর্শন। এ-লীলার লোকবিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল এ রকম :

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

চৈতন্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলো নতুন পদ-সাহিত্য—গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী। গৌরাঙ্গ-বন্দনায় বাংলা দেশ মুখর হয়ে উঠলো। বিভিন্ন বৈষ্ণব-পাটে প্রতিষ্ঠিত হোল গৌর-নিতাই মূর্তি। এ ভাবে বাঙালী 'প্রিয়েরে দেবতা' করলো। যে-চৈতন্য ছিলেন জীবন ক্ষেত্রে তাঁকে ভাবের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হোল। তাই বাংলা ও ব্রজবুলিতে লেখা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীতে চৈতন্যের অবতারত্বই প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁর মানবিক মূল্যবোধ তথা মহত্ত্ব তেমন পরিস্ফুট হয়নি। চৈতন্য-ভক্তকবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর উল্লেখযোগ্য কবি। এঁদের পদের বৈশিষ্ট্য কি ?

১. অবতারতত্ত্ব বর্ণন
২. গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব বর্ণন
৩. গৌরাঙ্গের নৃত্যপরায়ণ রূপ বর্ণন

৪. গৌরাঙ্গের করুণাঘন প্রেমিক রূপ বর্ণন

৫. গৌরাঙ্গের পতিত উদ্ধারকারী রূপ বর্ণন

৬. চৈতন্যের সন্ন্যাস রূপ বর্ণন

৭. চৈতন্য তত্ত্বের প্রকাশ

৮. গৌরনাগর ভাবের উল্লেখ ॥

শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরেও চৈতন্য-বন্দনা রীতি হয়ে দাঁড়ালো। মঙ্গল কাব্যেও এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈতন্য-বন্দনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও বৈষ্ণব কবির মতো।—

অবনিতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দহুঁ সন্ন্যাসী-চূড়ামণি
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দকন্দ
মুকতির দেখাল্যা সরণি।

একটা কথা আছে—দূর থেকে সরষে ক্ষেত ঘন দেখায়। সময়ের দূরত্বে চৈতন্য ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়েছেন। সময়ের নৈকট্যে চৈতন্য স্পষ্ট; সময়ের দূরত্বে চৈতন্য-মহিমা ঘন। এ কথার প্রমাণ—চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্য, জাতি-বর্ণ-ভেদ ও সামাজিক সচলতা

কাননবিহারী গোস্বামী

১.

ভারতবর্ষীয় সমাজে জাতি-বর্ণ-ভেদ দীর্ঘচলিত। সেই ভেদনির্ভর পরিমণ্ডলে পঞ্চদশ শতকের অন্তলগ্নে আবির্ভূত হয়ে যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর অলোকসামান্য চরিত্র প্রভাবে সমাজের স্থবির কাঠামোটাকে প্রচণ্ড নাড়া দিলেন। অচলায়তনে আনলেন অভূতপূর্ব সামাজিক সচলতা ('Social Mobility')। এই সচলতাকে দেখা যেতে পারে দুদিক থেকে। প্রথমত, একই সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত 'সমস্তর সচলতা' ('Horizontal Moblity')। দ্বিতীয়ত, ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত 'স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতা' ('Vertical Mobility')।

চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং পরম্পরা অনুসারে মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজের যে 'স্তরবিন্যাস ক্রমোচ্চ গড়ন' ('Hierarchical Structure'), তাতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ছিল সর্বোচ্চ স্থান এবং মান। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা বিপ্রকুলেও ছিল বৃত্তিভেদ ('Occupatinal division') এবং তার নিরিখে বৃত্তির পবিত্রতা-অপবিত্রতা, সদ্‌ব্রাহ্মণ-অসদ্‌ব্রাহ্মণ ভেদ। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তি-প্রভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের সমশ্রেণীতে যে মর্যাদাগত উন্নয়ন ('Sublimation') ঘটালেন, তাকে বলতে পারি 'সমস্তর সচলতা'। আবার, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিভুক্ত, সামাজিক স্তরবিন্যাসে ক্রমনিম্ন পর্যায়ের ('Lower rung of the hierarchical order') কিছু অসামান্য ভক্তিমান মানুষ তাঁর দিব্য প্রেরণায় বৈষ্ণবগুরু ও মহান্তরূপে বহুমান্য হলেন। এক্ষেত্রে ঘটল 'স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতা'। যবনরাও শ্রীচৈতন্য-সংস্রবে প্রেমী ভক্তে রূপান্তরিত হয়ে হিন্দুসমাজে মর্যাদা পেলেন। একেও ঐ 'ক্রমোচ্চ সচলতা' বলা যায়। দু শ্রেণীর সচলতার মূলেই মুখ্য প্রেরণাশক্তি ছিল প্রেমভক্তির। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মহাপ্রভু-

প্রবর্তিত এবং ভক্তিবাদ-প্রভাবিত এই সচলতাকে এক অর্থে 'প্রাযোজিত সচলতাও ('Sponsored Mobility') বলতে পারি। এই সচলতা এসেছে কখনো এক ভক্ত পরিবারে এক পুরুষের মধ্যেই। একে বলা যায় 'প্রজন্মান্তর্গত সচলতা' ('Intra-generational Mobility')। কখনো এই সচলতা একাধিক পুরুষ ধরে নানা প্রজন্মে সঞ্চারিত। এক বলি 'বহুপ্রজন্মবাহিত সচলতা' ('Multi-generational Mobility')। শ্রীচৈতন্যের সতীর্থ বৈদ্য মুরারি গুপ্ত বা প্রিয় পার্ষদ যবন হরিদাসের বহুমান্য বৈষ্ণব ভক্তি রূপান্তর এবং অন্যান্য সামাজিক মর্যাদা লাভ 'প্রজন্মান্তর্গত সচলতা'র নজীর। আবার শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পরিকর শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপূরের সামাজিক সম্মাননায় পাচ্ছি 'বহু-প্রজন্ম-বাহিত' সচলতার দৃষ্টান্ত।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রভাবে সমাজের নানা স্তরে নানা বৃত্তির অসংখ্য মানুষের জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ('aspirations') ও আদর্শ ('ideals') বদলে গেছে আমূল। তাদের বৃত্তি-পরিবর্তন, জীবনধারার বদল, চিরাচরিত সামাজিক স্তর থেকে সরে এসে 'ভিন্নগোষ্ঠী' ('dissident group') গঠন এবং নতুন সামাজিক মর্যাদা অর্জন জাতি-বর্ণ-ভেদের প্রথাশাসিত বাঙালী হিন্দুসমাজে জড়ত্বের শিলাস্তূপকে ভেঙে সামাজিক সচলতার জীবনস্রোতকে নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছে। তার প্রাণাবেগ ধর্মীয় হতে পারে, চরম লক্ষ্য হতে পারে শুদ্ধা ভক্তি,—কিন্তু তার সচলতার শক্তি এবং দূরবিস্তারী সামাজিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

২.

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত সামাজিক সচলতার স্বরূপ-সন্ধান বা রূপভেদের আলোচনায় প্রবেশের আগে ভারতবর্ষীয় তথা হিন্দু সমাজের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত কাঠামোয় জাতি ও বর্ণগত ভেদের স্থানটি একটু চিনে নেওয়া যাক।

ভারতীয় হিন্দু সমাজ ঐতিহ্যগত ভাবে প্রধান চারটি বর্ণ এবং অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত। ভারতের প্রত্ন ইতিহাসে ('proto history') মিশ্র তাম্র-প্রস্তর যুগে আদি অধিবাসী-দের যুদ্ধে হারিয়ে যে আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি গড়লেন, তাঁদের মূলত ছিল তিনটি বর্ণভেদ—ব্রাহ্মণ বা বিপ্র, ক্ষত্রিয় বা রাজন্য এবং বৈশ্য বা বিশ্র। এই ভেদ সামাজিক কর্তব্যের দায়িত্বভারভিত্তিক। প্রাচীন আর্য সমাজের এই ত্রিবর্ণ বিভাগকে প্রাচীন রোমক সমাজের milites, flamines এবং quirites এই ত্রিস্তর বিভাগ, কিংবা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কেল্টিক সমাজের (গল-জাতির) equites,

druides এবং plebs-এই ত্রিস্তর বিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আর্য-বিজিত প্রাগার্য জাতি, তথাকথিত 'দাস' বা 'দস্যু' নামে উপেক্ষিত ও ঘৃণিত মানুষগুলি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্রে পরিণত হ'ল। এদের স্থান হ'ল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে। স্তরবিন্যস্ত আর্য সমাজে সর্বোচ্চ স্থান ব্রাহ্মণদের; তারপর ক্রমনিম্ন পর্যায়ে স্থান ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের। প্রথমে এই বর্ণবিভাগ 'বংশানুক্রমিক' ('Hereditary') এবং 'সগোত্র-বিবাহ-ভিত্তিক' ('Endogamous') ছিল না, ছিল কৃত্য-নির্ভর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই ছিলেন 'দ্বিজ'—যজ্ঞসূত্র এবং উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী। সে যুগে বৃত্তিগত সচলতা ('Occupational mobility') অবাধ ছিল। ভৃগু ছিলেন মহামুনি ও স্তোত্র-রচয়িতা। কিন্তু তাঁর বংশধরগণ রথনির্মাণে দক্ষতা অর্জন করে। এটি বৈশ্যবৃত্তি। বিশ্বামিত্র, গর্গ, মুদ্গল প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। আবার পরশুরাম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম সাধন করেন। মগধের মৌর্যবংশ ছিল শূদ্র-বর্ণোদ্ভব; কিন্তু তাঁরা কালে ক্ষত্রিয়-রূপে পরিগণিত হলেন। নাভাগরিষ্ঠের দুই পুত্র বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ভারতে চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ যখন ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল, তখনও 'অসগোত্র বিবাহজ শ্রেণী' ('Hypergamous Section') নিন্দিত বা নিষিদ্ধ ছিল না। উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করলে সমাজে পতিত বা বর্ণচ্যুত হতেন না। ব্রাহ্মণ পরাশর ও ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার মিলন, কিংবা ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু ও দাসকন্যা সত্যবতীর বিবাহ এর উদাহরণ।

আদিতে ব্রাহ্মণদের সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ক্ষত্রিয়দের রজোগুণযুক্ত এবং বৈশ্যদের তমোগুণান্বিত মনে করা হ'ত। শূদ্রদের কোনো গুণাধিকারী ধরা হ'ত না। ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্তে' বলা হয়েছে প্রজাপতি বা বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হলেন। ক্ষত্রিয় বাহুরূপে নিষ্পাদিত হ'লেন; এঁর উরুদ্বয় বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র উৎপন্ন হ'ল:

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" ('ঋগ্বেদ', ১০/৯০।)

এখানেই পবিত্রতা-অপবিত্রতার স্তর ভেদে সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের ক্রম-প্রাধান্যগত ('Order of precedence') অবস্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

পরবর্তীকালে মহাকাব্যের যুগে ('Epic age') এই চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগকে গুণ-কর্মানুসারী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতান্তর্গত 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥" (৪/১৩।)

—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তার কর্তা হ'লেও অব্যয় আমাকে অকর্তা ব'লেই জানবে।

'গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্মসকল প্রকৃতি বা স্বভাবজাত ত্রিগুণ অনুসারেই পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তাণি স্বপ্রাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥" (১৮/৪১।)

উল্লিখিত চারটি বর্ণের কর্মবিভাগ এ-রকম :—

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, কায়িক-বাচিক-মানসিক তপস্যা, অন্তর্বহিঃ-শৌর্য, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস—এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম :

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥" (১৮/৪২।)

পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, ও শাসনক্ষমতা —এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম :

"শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥" (১৮/৪৩।)

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। পরিচর্যা শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম :

"কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥' (১৮/৪৪।)

আরো পরবর্তীকালে (খ্রী. পূ. ২০০ থেকে খ্রী. ২০০ অব্দের মধ্যে) 'মনুসংহিতা'য় এই গুণকর্মবিভাগানুসারী চাতুর্বর্ণ্য-প্রথাকেই সমর্থন করা হয়েছে এবং সমাজে বিভিন্ন বর্ণের স্থান আরো বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত ও সুনিরূপিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'মনুসংহিতা'র দশম অধ্যায়ে ৫৯-৬০ শ্লোক এবং ৭০-৭৩ শ্লোকে বিস্তারিত উপদেশ আছে।

বর্ণ এবং বৃত্তিবিভাগ থেকে ঘটল জাতি-প্রথার উৎপত্তি, ক্রমবিস্তার এবং তার অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ। কৃষি বা শিল্পকর্ম বা বাণিজ্যের এক-একটি বৃত্তি এক-একটি জাতির নির্ণায়ক লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। ফলে একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে নির্দিষ্ট হ'ল নানা জাতি। আর্যযুগেই ক্রমপ্রসরমাণ হিন্দুসমাজে প্রাগার্য অরণ্যবাসী বা পর্বত-

বাসীদের স্থান দিতে গিয়ে জাতিপ্রথা বিস্তারিত হয়। কিন্তু কোনো জাতির কর্ম বা বৃত্তি সুপরিচিত চাতুর্বর্ণ্যের ছকে ফেলতে না পারলে ঐ জাতিকে কোন্ বর্ণে স্থান দেওয়া যাবে এ-নিয়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রভৃতি স্মৃতি-সংহিতাকারদের চিন্তা অন্তহীন। 'মনুসংহিতা'র দশম অধ্যায়ে ৪৭-সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, "বর্ণবহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত সংকর-জাতিসম্ভূত ব্যক্তির কর্ম দেখে জাতি নির্ণয় করবে।" আর্য ও প্রাগার্যদের অনিবার্য মিলনে এই বর্ণসাংকর্য, জাতিসাংকর্য, এবং জাতির বহুধাবিস্তার ('proliferation') ইতিহাসের ধারায় ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই বর্ণসাংকর্য বা জাতিসাংকর্য এবং উচ্চতর বর্ণ থেকে নিম্নতর বর্ণে অবনমন 'মনুসংহিতা'য় নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় পিতার শূদ্রাগর্ভজাত সন্তানের নাম উগ্র, এবং সে ক্রূরচেতা ও ক্রূরকর্মা। ঔড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ—এই সব দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে শূদ্রত্ব লাভ করে।

বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতি স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত থাকত; ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া মূলতঃ ছিল প্রতিযোগিতাহীন (non-competitive)। রাজশক্তিও ব্রাহ্মণদের উপদেশ-মতো প্রতি জাতিকে নিজ নিজ বিশিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে সাহায্য করত। কিন্তু কালে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন ধারায় যথেষ্ট উৎকর্ষ ঘটলে যারা কৌলিক বৃত্তি ছেড়ে নতুন উন্নততর পদ্ধতি গ্রহণ করল, তারা সৃষ্টি করল নতুন জাতি। তারা মূল জাতি থেকে অন্ন ও বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে এক একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হ'ল। এরা নিম্নবর্ণ বা জাতি সম্ভূত হ'লেও, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উচ্চবর্ণ ও জাতির আচার-আচরণাদি অনুসরণ করতে থাকল। প্রধানতঃ উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির এই অনুসরণ-প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে 'সংস্কৃতায়ন' ('Sanskrtiz ation')।

বর্ণাশ্রয়ী ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত সমাজে উচ্চ ও নীচের ভেদাভেদ ছিল গুণানুযায়ী এবং বৃত্তির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে 'উত্তম', ও কতকগুলিকে 'অধম' ধরা হ'ত। যেমন কুক্কুট ও শূকরভোজী এবং মৎস্যজীবী হেয় জাতি। গর্দভপালক অশুদ্ধ, কিন্তু গোপালক ও অশ্বপালক শুদ্ধ। চর্মকার এবং কার্পাসবস্ত্র-উৎপাদক অশুদ্ধ, কিন্তু পশম বা রেশম বস্ত্র উৎপাদক শুদ্ধ। অশুদ্ধ বৃত্তিধারী বা হেয় জাতির মধ্যে কেউ অজলচল, কেউ অস্পৃশ্য, কেউ বা অদর্শনীয়। উচ্চ জাতি এবং নিম্ন জাতির মাঝখানে ছিল কিছু মধ্যবর্তী জাতি ('Intermediories') যারা

জন্মাচরণীয় এবং 'সৎ' শব্দে বিশেষিত। এই সব বিভাগ-উপবিভাগ থেকে ভারতবর্ষে জাতির সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী।

ভারতে শ্রমবিভাগকে ('Division of Labour') অবলম্বন ক'রে যে চাতুর্বর্ণ্য প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমে বৃত্তিভেদ ও কুলকর্ম অনুসারে অসংখ্য জাতিভেদে রূপ পেল। কালে জাতিভেদ প্রথা হয়ে-দাঁড়াল .প্রাতিষ্ঠানিক ('Cast as an institution')। এরই গোলক ধাঁধায় সমাজ জীবন পাক খেয়ে চলছিল। ফলে জাতিভেদ-প্রথা হয়ে উঠল অনেকটা সামাজিক জড়ত্ব বা অচলতার সমার্থক। জাতিভেদ প্রথা পুরুষ পরম্পরায় ভারতীয় সমাজকে যেমন একটা স্থিতি দিয়েছে তেমনি তার পরিবর্তনশীলতা এবং প্রাণাবেগকেও অনেকটা ক্ষুন্ন করেছে।

ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও জাতিভেদ-প্রথার সুচিরস্থায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশবাসীর ভাবগত ধ্যানধারণায় পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদ। ধর্ম বা নীতি চেতনা এবং মোক্ষচেতনা এদেরই অঙ্গ। ভারতীয় দর্শনের একটি গোড়ার কথাই হল কর্মফলবাদ ও মোক্ষবাদ। সমাজের যে স্তরে যে বর্ণ বা জাতির মধ্যে যে কেউ জন্মেছে, তার সে জন্ম পূর্বজন্মের কর্মফলে। এক জন্মের ফল শুধু পরজন্মে নয়, জন্ম-জন্মান্তরে বর্তায়। ইহজন্মে সমাজনির্দিষ্ট যথাবিহিত কর্ম ক'রেই কর্মফলক্ষয় এবং ভাবীজন্মের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ এবং জাতির মধ্যে কারো জন্ম তার আত্মার মোক্ষপথে অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতির পরিচায়ক। 'Caste in Modern India and Other Essays' গ্রন্থে M. N. Srinivas বিষয়টিকে এভাবে বুঝিয়েছেন—"The Progress and retrogression of a soul goes on until it attains salvation.······Broth in a particular caste becomes an index of a soul's progess toward salvation." (P, 150—51) সুতরাং স্বজাতির যথা নির্দিষ্ট কৃত্যই ধর্ম। তা অলঙ্ঘনীয়। জাতিগত ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে কারো স্থান এজন্যই আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যে পূর্ণ। Max Weber জাতি-প্রথার সঙ্গে কর্মফল বাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, এর ফলেই পরম্পরাগত জাতিবিষয়ক আনুষ্ঠানিকতার ধারণাকে পাল্টে সেখানে প্রগতির কোনো বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থ নৈতিক কাঠামোর যুক্তিসঙ্গত রূপান্তরেও তা অসাধ্যই থেকে যেত। Weber-এর সিদ্ধান্ত "So long as the Karma Doctrine was unshaken, revolutionary ideas of progessivism were inconceivable," এবং সে-হেতু "it was impossible to shatter

traditionalism based on caste ritualism anchored in Karma Doctrine by rationalizing the economy." (The Religion of India, P, 121—123)। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু অবশ্য ভারতীয় সমাজে জাতি-প্রথার প্রবহমানতা ও স্থায়িত্বের কারণ হিসেবে কোনো ধর্মীয় আদর্শকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে, প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা প্রতিটি বৃত্তিধারী জাতিকে অভাবের সময় ন্যূনতম নিরাপত্তা জুগিয়েছিল। অর্থাৎ, এই প্রথার স্থায়িত্বের মূল কারণটা অর্থ নৈতিক। কর্মফলবাদ বুদ্ধদেব-প্রচারিত কর্মপ্রয়াসের বিরোধী মতবাদ। কর্মফলবাদ এবং আত্মার মোক্ষলাভের ধারণাকে গড়ে তোলা হয়েছিল দৈবনির্ভরতা-বাদের সমর্থনে, যা বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও আদর্শের বিরোধী। কোনো কোনো হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে, যেমন 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে,' দৈবের উর্ধ্বে পুরুষকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরুষকার যদি দৈবের উপর জয়ী হয়, তাহলে কর্মফলবাদ এবং দৈবনির্ভরতা টিকতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ভক্তি-আন্দোলনের ফলে প্রেমকে (অবশ্যই তা ভাগবত প্রেম) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রচলিত চতুর্বর্গের উর্ধ্বে পঞ্চম পুরুষার্থ-রূপে স্থাপনা করলেন। এর ফলে বর্ণভেদ ও জাতিপ্রথার নিগড়ে আবদ্ধ সমাজচৈতন্যের ঘটল জ্যোতির্ময় মুক্তি!

৩

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে গৌড়-বঙ্গে হিন্দু-সমাজে চাতুর্বর্ণ্য ও জাতিভেদপ্রথা জাঁকিয়ে বসেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আচরণ বিধির আদর্শ ('Pan Idian ideals of cultural norms') গড়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই শতকের মধ্যেই গুপ্তযুগে বাঙলার আর্যীকরণ অনেকটা ঘটে গেছে। নবম-দশম শতকে পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারিত হ'য়ে গুপ্ত ব্রাহ্মণ্যসংস্কার এবং জাতিবর্ণভেদ প্রথাকে কিছুটা স্তিমিত রাখে। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকে কর্ণাটী ব্রাহ্মণ সেনদের রাজত্বকালে এই প্রথা নতুন শক্তি নিয়ে আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বল্লাল সেন যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন কালে তা উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের মধ্যে অসংখ্য স্তরবিন্যস্ত বিভাগ-উপবিভাগকে চিহ্নিত করল। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী বিজয়ে বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে লেগেছিল একটা প্রচণ্ড

আঘাত। বিজয়ী মুসলমানরা ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত জাতিবর্ণভেদ প্রথার ধার ধারত না, তারা কুলকর্ম বা বৃত্তির অলঙ্ঘনীয়তাও মানত না। ইসলামী অভিঘাত এবং ঐ ধর্মে নিম্নজাতির আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতা থেকে হিন্দুসমাজকে বাঁচাতে সেদিন একদিকে ঐতিহ্যপন্থী সমাজপতিরা ব্রাহ্মণ্য আদর্শে নানা বিধিনিষেধ স্মৃতি-শাস্ত্র-সংহিতার বাঁধনে সমাজকে আরো কড়াকড়ি-ভাবে বাঁধলেন, অন্যদিকে নিম্নবর্ণ ও অন্ত্যজ জাতির লৌকিক দেবমণ্ডলীকে উচ্চতর বর্ণহিন্দু সমাজে ঠাঁই দিয়ে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করলেন। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উদ্ভব এভাবেই। শ্রীচৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে যে মঙ্গলচণ্ডী, বাশুলী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার বিশেষ প্রাধান্য, 'চৈতন্য ভাগবতে'র একাধিক স্থানে তার উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবনদাস। পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই দেবীবর ঘটক কৌলীন্য প্রথার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের 'মেল' এবং 'থাক' সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বর্ণ এবং জাতিভেদ তখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে অগণ্য শাখা-প্রশাখায় জটিল। ব্রাহ্মণদের শাণ্ডিল্য গোত্রে ষোল গাঁই, কাশ্যপ গোত্রে ষোল গাঁই, ভরদ্বাজ গোত্রে চার গাঁই, সাবর্ণ গোত্রে বারো গাঁই এবং বাৎস্য গোত্রে আট গাঁই—এই ছাপ্পানো গাঁই তো বাসস্থান অনুসারে ছিলই। এছাড়া ছিল 'সপ্তশতী' নামের অশ্রদ্ধেয় সাতশো ঘর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের ছাপ্পানো গাঁইকে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ভেদে আরো তিনটি 'শ্রেণী'তে ভাগ করা হয়। দেবীবর কুলীনদেরও ছত্রিশটি 'মেলে' বদ্ধ করলেন। জাত-পাতের ভেদাভেদ উগ্র থেকে উগ্রতর হ'ল। নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্র ও নব্যন্যায় চর্চা জাতিবর্ণ-প্রথার বাঁধন ও সংস্কারকে আরো দৃঢ় ক'রে তুলল।

এই পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'। তিনি নিজে শ্রীহট্টের বহুমানিত বাৎস্য গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ মিশ্র পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু দিব্যপ্রেম ও ভক্তিপথিক শ্রীচৈতন্য সমাজের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে ব্রাহ্মণের সর্বপ্রাধান্য মানেননি। চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগের পরিবর্তে সম্ভবতঃ তাঁর অভিপ্রেত ছিল ষড়বর্ণ-বিন্যাস। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' এর উল্লেখ পাই। 'বৈরাগ্যখণ্ডে' দেখি, স্বপারিষদবর্গকে—

"গৌরচন্দ্র বলে শুন মনুষ্যজন্ম বড়।
মনুষ্যজন্মে মহান্ত বৈষ্ণব হএ দড়॥
নির্জীবে সজীব শ্রেষ্ঠ স্থাবর জঙ্গম।
জঙ্গমে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জাতি অনুক্রম॥

শূদ্র জাতি শ্রেষ্ঠ বৈশ্য বৈশ্য শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রি।
ক্ষেত্রিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠ যতি॥
যতিরে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ হএ।
বৈষ্ণবের সমান পদ আর কেহো নয়॥" (বৈরাগ্য ৭—১০।)
[এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, পৃঃ ১১৬।]

এখানে বর্ণের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসটি এরকম: শূদ্র→বৈশ্য→ক্ষত্রিয়→ব্রাহ্মণ→যতি→বৈষ্ণব।

১৪০৭ শক বা ৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মতান্তরে ১৯শে বা ২৭শে ফেব্রুয়ারী) পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের উদয়। ১৪৩১ শকের মাঘ সংক্রান্তিতে (১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী) কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে তাঁর সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ। ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ় (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন), রথ-পরবর্তী সপ্তমীতে মহাপ্রভুর অপ্রকট। সন্ন্যাসের পর মর্ত্যে তাঁর ২৪ বছর প্রকটকালের মধ্যে প্রায় সর্বদাই তাঁর অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমমত্ততা। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও তিনি স্বানুভূত আদর্শে যতি ও বৈষ্ণবচূড়ামণি। শ্রীচৈতন্য তাঁর দিব্যজীবনে এই ছয় বর্ণবিন্যাসের কোনোটির মধ্যেই আবার বাঁধা থাকতে চান নি। 'শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি' গ্রন্থে আচার্য জনাদন চক্রবর্তী 'শ্রীচৈতন্যের নিজের উক্তি বলে প্রচলিত' একটি শ্লোক উৎকলন করেছেন। সেটি এখানে উদ্ধারযোগ্য:

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো বা
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ [পৃঃ ১৮৪।]

এখানে দেখা যাচ্ছে, মহাপ্রভু নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কিংবা বর্ণাশ্রমী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, যতি কিছুই বলেন নি। তিনি নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতসিন্ধু গোপীজনবল্লভের পদকমলাশ্রয়ী দাসের দাসানুদাস। এখানে শ্রীকৃষ্ণশরণাগতিই মানব অস্তিত্বের চরমতম কাম্য বস্তু।

শ্রীচৈতন্য যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ভারতীয় সমাজের উচ্চতম পর্যায়ে ব্রাহ্মণদের সর্বশ্রেষ্ঠত্বকে মানেন নি তার একটি মূল কারণ—সদগুণ, সদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের আত্যন্তিক বহির্মুখিতা, বিষয়সর্বস্বতা ও ভক্তিহীনতা; সেইসঙ্গে তাদের বিদ্যাদর্প ও ঐশ্বর্যাভিমান। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ

ঘোষণা ক'রে শ্রীচৈতন্য ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের অসারতা এবং অযুগোপযোগিতা দেখিয়ে দিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা—

"চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥

শচীমাতাকে মহাপ্রভু বলেছিলেন—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে, যদি অসৎপথে চলে॥" (চৈতন্যভাগবত / বৃন্দাবনদাস / মধ্য খণ্ড ১। ১৯৭)

যবন হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের উক্তি—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥ (চৈ. ভা.। মধ্য খণ্ড, ১০।৯৯।)

এই যে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ঘোষণা, যবন হরিদাসকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে বহুমান-দান—এদুটি ক্ষেত্রে চণ্ডাল ও যবনের Vertical Mobility বা স্তরবিন্যস্ত সমাজে ক্রমোচ্চ সচলতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ভক্তিবাদ ও আন্দোলন (Bhakti Cult and Movement) একটি প্রবল সামাজিক (ধর্মীয় তো বটেই) আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, রামদাস, দাদূ, সুরদাস প্রভৃতি ভারত পথিকগণ কেউই জাতিভেদপ্রথা মানতেন না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রেম ভক্তির আদর্শ সেযুগে বাঙালী হিন্দুসমাজে বৈশ্য, শূদ্র, পতিত, অন্ত্যজ, অজলচল, অস্পৃশ্য--রূপে চিহ্নিত, উপেক্ষিত, অবহেলিত, অশ্রদ্ধেয়, নির্যাতিত মানুষগুলির সামনে জীবনের নতুন আশা-উদ্দীপনা-আশ্রয়ের স্বর্ণছবি এঁকে দেয়। জন্ম এবং কুলাচার যে অলঙ্ঘনীয় নয়, বৃত্তি যে চিরন্তন হতে পারে না, কর্মফল জন্ম-জন্মান্তর-বাহী নয়, দৈবের বিধান নয় সর্ববলীয়ান—সমাজের সর্বস্তরের বিশেষতঃ নিম্ন পর্যায়ের আশাহত নরনারীর অন্তরে এই বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় জেগে উঠল শ্রীচৈতন্যেরই প্রেমভক্তিবাদের কল্যাণে। পূর্বাপর প্রচলিত কৃচ্ছ্রসাধ্য ও ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, কিংবা জাঁকজমকের পূজার্চনাদি নয়, শুধু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণেই প্রেমভক্তি লভ্য—মহাপ্রভু প্রদত্ত এই পরম আশ্বাস নিম্নবর্ণ ও জাতির জীবনচেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। বাংলায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য—এই তিন প্রভু এবং তাঁদের পরিবারবর্গের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মের যে প্রচার এবং প্রসার ঘটেছে তার প্রধান

ক্ষেত্র এবং অবলম্বন ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত সমাজের এই নিম্নবর্ণ ও জাতি কুলাংশ। সমাজের এই তথাকথিত নিম্নাংশেই ঘটেছে ভক্তিধর্ম আশ্রয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রচর্চা, ভাগবত পাঠ-শ্রবণ, বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা, তুলসীমঞ্চ স্থাপন, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে নতুন মর্যাদা অর্জন এবং তারই ফলে সমস্তর ও ঊর্ধ্বস্তর সামাজিক সচলতা। জাতিবর্ণভেদ প্রথা যে স্থাণুত্বে (Stagnation) সমাজকে অনড়প্রায় করে রেখেছিল সেখান থেকে ঘটল মহামুক্তি। দৈবের উপর প্রেমীভক্তের দিব্য ভক্তিপূত পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তি-আশ্রয়ে জাতি-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মুক্তির অধিকার এই সামাজিক সচলতাকে বেগমুখর করে তোলে। 'Social Mobility in Bengal' গ্রন্থে ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল বিষয়টির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান এবং স্মরণীয় :

"*Bhakti* movement which was led by Sri Chaitanyadeva in Bengal was avowedly meant for the social and spiritual upliftment of the oppressed section of the society. Its great empharis on individual merit irrespective of cast and economic position, simple rites, congregational worhip and social communication among the different strata of society put *Bhakti* movment in sharp contrast to the hierarchial system of Smarta Puranic Brahmanism practised in Bengal and constituted a tremendous social appeal which made *Bhakti* movement imediatly acceptable to the lower strata of the society. Naturaly Gaudiya Vaisnavism became favourite with the people belonging to the lower strata of the society, particularly with those who aspired for social eminence and Mobility." (Social Mobility in Bengal—Its Sources and Constraints. Pp 58-59.)

শ্রীচৈতন্য বারবার বলেছেন, তিনি শূদ্র, অধম মূর্খ, নারী, দুর্গত, পতিত সর্বজনকে নামপ্রেমে মত্ত ও উদ্ধার করবেন। মহাপ্রভু সকলকে দেবদুর্লভ ভক্তিধন বিলিয়ে দেবার সংকল্প প্রকাশ করলে অদ্বৈতাচার্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন—

" যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥" (চৈ ভা। মধ্য ৬।১৬৭।)

শ্রীচৈতন্য ভক্তের এই প্রার্থনা অঙ্গীকার করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর রামকেলি গ্রামে অবস্থানের সময় শ্রীচৈতন্য রাজভয়ভীত অনুচর পরিকরগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—

"সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥"

(চৈ. ভা. । অন্ত্য, ৪।১২০-১২৩।)

যবনস্পর্শে ব্রাহ্মণের পাতিত্য দোষ হ'লে স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণসমাজে তার কোনো ক্ষমা অথবা স্থান ছিল না। সুলতান হোসেন শাহ বেগমের অনুরোধে তাঁর পূর্বপ্রভু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়ের মুখে 'করোয়ার পানি' ঢেলে তাঁর জাতিনাশ করেন। স্মার্ত পণ্ডিতগণ এর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করলেন—তপ্ত ঘৃতপানে প্রাণত্যাগ করতে হবে। বারাণসীতে মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিলেন সুবুদ্ধি রায়। দীনবৎসল প্রভু তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে নবজীবনের সন্ধান দিলেন—

"প্রভু মতে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥"

('চৈতন্য চরিতামৃত' / কৃষ্ণদাস কবিরাজ / মধ্যলীলা, ২৫।)

শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম-সংকীতন আন্দোলনে নবদ্বীপে চাঁদকাজী দলন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দুধর্মদ্বেষী কাজী ঘোষণা করেছিলেন, যে প্রকাশ্যে কীর্তন করবে 'সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু' (চৈ. চ. / আদি ১৭।) এই 'অবিধির বিধি' ('Lawless Law') প্রচার এবং জাতিচ্যুতির ক্রম সৃষ্টির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কল্প—'আজি সব যবনের করিব প্রলয়' (চৈ. ভা. / মধ্য, ২৩।) এবং 'সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন' (ঐ)। মহাপ্রভু তিন সম্প্রদায়ে সজ্জিত কীর্তনদল

পরিচালনা ক'রে নিয়ে গেলেন কাজীর দ্বারে। তখন প্রবল জনসংঘট্ট দেখে এবং 'কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে' (চৈ. চ. / আদি, ১৭।) শেষ পর্যন্ত কাজী গৌরহরির আমন্ত্রণে ঘর থেকে বার হয়ে এল এবং শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হয়ে ঘোষণা করল—

"………মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব—কীর্ত্তন না বাধিবে॥" (চৈ. চ. / আদি ১৭।)

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম লীলা পার্ষদ গদাধর দাস আড়িয়াদহের কাজীকে 'হরিনাম' বলিয়েছিলেন। গদাধরের অনুরোধে—

"হাসি বলে কাজি—শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাঙ 'হরি' আজি যাহ ঘর॥" (চৈ. ভা. / অন্ত্য ৫।)

কাজীর এ-কথা শুনে—

"গদাধর দাস বলে—আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥" (ঐ)

'চৈতন্য চরিতামৃতে'র মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের বহু যবন-পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিয়ে 'মহাভাগবত' করার বিবরণ দিয়েছেন। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচারে 'ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর….পীর'কে পরাস্ত ক'রে তাঁকে বৈষ্ণব ভক্ত করেন এবং নাম দেন 'রামদাস'। রামদাসের প্রভু পাঠান রাজকুমার বিজুলীখানও মহাপ্রভুর কাছে বৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে বৈষ্ণব হন—

"সেই বিজুলী খান হইল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥" (চৈ. চ. / মধ্য ১৮।)

আমরা আগে 'মনুসংহিতা'য় জাতিভেদের আলোচনায় দেখেছি যবন দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়দের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত হিন্দুসমাজে সর্বনিম্নস্তরে শূদ্র বলে স্থান দেওয়া হ'ত। কিন্তু মহাপ্রভু যবন-রাজকুমার এবং তাঁর অনুচরদের হিন্দুসমাজে বরণ করলেন 'মহাভাগবত'-রূপে, এবং তারা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বৈষ্ণব-রূপে পরিগৃহীত হয়ে পরম মহত্ত্ব লাভ করল। বিধর্মী বিজাতীয় ক্ষত্রিয় থেকে বৈষ্ণবের সর্বোচ্চ স্তরে এই ঊর্ধ্বগতিকে সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে 'Vertical Mobility' বা 'স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতা' বলা যায় অনায়াসেই।

যবন হরিদাসকে মহাপ্রভু যে উচ্চ সম্মান দিয়ে আপন অন্তরঙ্গ পার্ষদ-রূপে বরণ করেন, সে ক্ষেত্রেও, এই স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতারই পরিচয় পাই। হরিদাস

মহাপ্রভুর কাছে দৈন্যার্তি জানিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অস্পৃশ্যতার উল্লেখ ক'রে যথার্থ বৈষ্ণবোচিত বিনয় করেছিলেন—

"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমাত॥
নিগুর্ণ অধম সর্বজাতিবহিস্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান॥"

(চৈ. ভা. / মধ্য, ৫৮—৬০।)

মহাপ্রভু হরিদাসকে আপন স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড়॥" (ঐ / মধ্য, ৩৬।)

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতনয় পণ্ডিতবরিষ্ঠ শ্রীচৈতন্য বললেন, পরম বৈষ্ণব যবন হরিদাস এবং তাঁর জাতি এক! মধ্যযুগীয় ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত হিন্দুসমাজে এ কথা অকল্পনীয়! হরিদাসকে স্বগৃহে অতিথি সেবা করিয়ে মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলেছিলেন—"মহান্তের সেবা অনেক ভাগ্যোদয়" ('চৈতন্যমঙ্গল' / জয়ানন্দ / নদীয়াখণ্ড, ২৮।) নীলাচলে হরিদাসের নির্বাণকালে শ্রীচৈতন্য তাঁর এই প্রাণপ্রিয় পার্ষদের মরদেহ কোলে তুলে নিয়ে প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে নেচেছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি নিজহাতে ঐ ভক্তদেহকে সমুদ্রজলে স্নান করানোর পর বালুসমাধি দিয়েছিলেন—"আপনে স্বহস্তে বালু দিল তার গায়।" (চৈ. চ. / অন্ত্য ১১।) জগন্নাথ মন্দিরের পসারীদের কাছে গিয়ে মহাপ্রভু আঁচল পাতলেন—

"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে॥" (ঐ / অন্ত্য, ১১।)

এই মহোৎসব থেকেই বৈষ্ণবসমাজে মহান্তগণের তিরোভাব-মহোৎসবের প্রচলন, যার সঙ্গে মিল আছে মুসলমান সাধক-পীরদের 'উরস'-উৎসবের।

মহাপ্রভুর কৃপাধন্য অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীসনাতন এবং শ্রীরূপের জন্ম ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণবংশে। কিন্তু গৌড়েশ্বর যবন-সুলতান হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সাকর মল্লিক এবং দবীর খাস-রূপে রাজসভায় ধৃত হওয়ায় তাঁদের যবনসংস্পর্শে পাতিত্য দোষ ঘটেছিল। রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের আগমন জেনে

অর্ধরাত্রে গোপন বেশে দুভাই 'দন্তে তৃণ ধরি' প্রভুর কাছে এলেন। দৈন্য-স্তুতি করে জোড় হাতে বললেন :

"ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গোব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম মোর হাথে গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥" (চৈ. চ. / মধ্য, ১।)

তখন—

"শুনি প্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে কাটে মোর মন ॥.......
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে উদ্ধার ॥" (ঐ / মধ্য, ১।)

রূপ-সনাতন পরে গৌড়ের রাজকর্ম ছেড়ে সুলতানের কাছ থেকে পালিয়ে শ্রীচৈতন্যের পরম কৃপাধন্য হন। মহাপ্রভু তাঁদের বৈষ্ণবীয় তত্ত্বশিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠালেন। বৈষ্ণব ভজনের আদর্শ স্থাপন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা এবং বৃন্দাবনে বৈষ্ণব কেন্দ্র স্থাপনের ভার দিয়েছিলেন মহাপ্রভু এঁদেরই উপযুক্ত হাতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের বহুমানিতাকেও প্রেমভক্তির আদর্শে ত্বরান্বিত ক্রমোচ্চ সামাজিক সচলতা বলা যায়।

এই শ্রেণীর সামাজিক সচলতার আর এক জাতীয় নিদর্শন শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রভাবে অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুগণের সমাজে বহুমান্যতা লাভ। শ্রীখণ্ডে বৈদ্য নরহরি সরকার ঠাকুর, খেতরীতে কায়স্থ নরোত্তম দাস, গোপীবল্লভপুরে সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ দাস বৈষ্ণব গুরুরূপে সকলের পরম শ্রদ্ধাভাজন হন—তাঁদের ব্রাহ্মণ শিষ্যাদিও ছিল। সপ্তগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য হয়ে বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামীর অন্যতম রূপে পূজিত হলেন। শ্রীচৈতন্য পরিকরগণের মধ্যে বৈদ্য মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, সদাশিব কবিরাজ, বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত, কায়স্থ

মকরধ্বজ কর এবং গোবিন্দ-মাধব রামু-ঘোষ তিন ভাই, আরো বহু অব্রাহ্মণ ভক্ত শুধু বৈষ্ণবসমাজে নয়, সমগ্র গৌড়ীয় সমাজেই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

সমাজে শূদ্র রূপে অবহেলিত এবং নীচ জাতি বলে নির্যাতিত নিম্নবর্গের নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় দিয়ে তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ছিল শ্রীচৈতন্যের অন্যতম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে নীলাচল থেকে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও ভাগীরথীর দুই কূলে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অকাতরে হরিনাম প্রচার ও প্রেম বিতরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দকে শূদ্রদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এবং তাদের সঙ্গে আহার বিহার করতে দেখে মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক বিপ্র নীলাচলে তাঁর কাছে অনুযোগ করেছিলেন—

"শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥" (চৈ. ভা.। অন্ত ৬।)

শ্রীচৈতন্য প্রত্যুত্তরে নিত্যানন্দের আচরণকে সমর্থন করে বলেছিলেন—

গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজ॥" (ঐ। অন্ত ৬।)

কারণ— মহা অধিকারী যে বা হয়।
তবে তান দোষগুণ কিছু না জন্ময়॥ (ঐ। অন্ত্য ৬)

মহাপ্রভু উত্তম জানতেন, গৌড়ে নামপ্রেম প্রচারে এবং বৈষ্ণব দীক্ষায় শূদ্র ও অন্ত্যজদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শ্রীনিত্যানন্দের চেয়ে মহা অধিকারী আর কেউ সেযুগে ছিলেন না।

শ্রীনিত্যানন্দ তনয় বীরভদ্র গোস্বামী পিতারই দিব্য আদর্শে দীক্ষিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বীরভদ্রকে বলেছেন 'চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেহোঁ মূল স্তম্ভ' (আদি, ১১।) বীরভদ্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 'বারোশত নাড়া আর তেরোশত নাড়ী', অর্থাৎ নেড়ানেড়ি নামে উপেক্ষিত হিন্দু সমাজ বহির্ভূত অসংখ্য নরনারীকে খড়দহ শ্রীপাটে বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় দেন। এই আশ্রয়দানের পুণ্যস্মরণে খড়দহে সুদীর্ঘকাল 'নেড়ানেড়ির মেলা' প্রচলিত ছিল। বীরভদ্র শ্রীনিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবীর শিষ্য। জাহ্নবীর মাতার অপর পুত্রকৃতক শিষ্য, শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ও প্রত্যক্ষলীলাদর্শী পদকার বংশীবদন চট্টোর পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামীও বাঘনাপাড়া শ্রীপাটে এই নেড়ানেড়িদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখনো প্রতি বৎসর বাঘনাপাড়ায় বলরাম কৃষ্ণ মন্দিরে রামচন্দ্র

গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া থেকে ছয় দিন ব্যাপী যে স্মরণ-মহোৎসব হয়, তাতে প্রতিদিন নেড়ানেড়িদের 'বিদায়' বা সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়। তাঁদের সম্মান দক্ষিণা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। অন্ত্যজ, শূদ্রদের এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও রূপান্তরিত বৈষ্ণব নেড়ানেড়িদের সম্মাননা স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সামাজিক সচলতার আর এক-জাতীয় নিদর্শন।

শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রভাবে সমস্তর সামাজিক সচলতার (Horizontal Mobility) কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর 'Social Mobility in Bengal' গ্রন্থে বাংলায় জাতিগত ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে ('Caste hierarcy') বিভিন্ন জাতিকে পরম্পরাগত ভাবে ছটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। এই বিভাগগুলি হ'ল—১. ব্রাহ্মণ, ২. বৈদ্য ও কায়স্থ, ৩. নবশাখ, ৪. অজলচল, ৫. নবশাখ ও অজলচলের মধ্যবর্তী এবং ৬. অন্ত্যজ। পরম্পরাগত এই জাতি বিভাগ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও ছিল। এদের মধ্যে নবশাখদের গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে বেড়ে ৯টি জাতির স্থানে এখন ১৪টিতে দাঁড়িয়েছে। আদিতে নবশাখরা ছিল—

তিলী, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোছালী।
কামার, কুমার, পুঁটলী ইতি নবশাখাবলী ॥

অর্থাৎ, তেলী, মালী, তামুলী (তাম্বুলবণিক), গোয়ালা, নাপিত, বারুই (পানচাষী) কামার, কুমোর এবং গন্ধবণিক ('পুঁটলী')—এই ছটি জাতি নিয়ে নবশাখাবলী।

শ্রীচৈতন্যের পরিকর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ও বৈদ্য ছিলেন, আমরা আগেই তা দেখেছি। বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয়ে এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভে সমাজে এঁদের যে বহুমান তা নিজ নিজ বৃত্তি এবং কুল-পরিচয় বজায় রেখেই। সুতরাং প্রেমভক্তিলাভে এঁদের যে মর্যাদা বৃদ্ধি তাকে সমস্তর সামাজিক সচলতা বলা যেতে পারে। নবশাখদের অনেকের সঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা ছিল। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবতে'র আদি খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে দেখি, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে নগরভ্রমণ উপলক্ষে প্রথমেই গেলেন 'তন্তুবায়দের দুয়ারে'। তাঁতি তাঁকে নববস্ত্র দিয়ে সম্মান দেখাল। তারপর 'উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী'। তিনি দধি-দুগ্ধের 'মহাদান' নিতে চাইলেও গোয়ালারা বলল—'চল মামা, ভাত খাই গিযা।' সে যুগে শ্রেষ্ঠ সদ্ ব্রাহ্মণকে গোয়ালার ভাত খেতে আমন্ত্রণ তাদের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের গভীর মমত্ববুদ্ধির নিদর্শন। এর ভাক্তিমার্গীয়

ব্যাখ্যা—শ্রীচৈতন্যই দ্বাপরে ব্রজে নন্দগোপের গৃহে পালিত শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং গোয়ালার ঘরে ভাত খাওয়ার আহ্বান তাঁর পূর্বলীলা প্রসঙ্গ স্মরণ। ভক্তিমার্গীয় ব্যাখ্যা যাইহোক, শ্রীগৌরাঙ্গ যে আত্যন্তিক জাতিভেদপ্রথা মানতেন না এবং গোয়ালার ঘরে ভাত খাওয়াকে জাতিচ্যুতি মনে করতেন না, এ-কথা এখানে সুস্পষ্ট। এরপর গৌরচন্দ্র একে একে গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী ও শঙ্খবণিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন। এরা সকলেই নিজের নিজের বৃত্তি এবং সামাজিক স্তরে স্থিত। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ এই নবশাখদের মধ্যে যাদের যাদের ঘরে গেলেন তাদের পরিবার এবং উত্তরপুরুষগণ সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল অবশ্যই। সুতরাং এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় এদের ঘটেছিল সমস্তর সচলতা।

ষোলো শতক থেকে একাল পর্যন্ত বাংলায় যে সামাজিক সচলতা ঘটেছে তার চারটি ধারা লক্ষ্য করেছেন ডঃ সান্যাল। তাঁর বিচারে—

(১) "The first type of mobility occurred within the individual jati's, i. e. castes." (P. 42) স্বজাতির মধ্যে ঠিক এ-জাতীয় সচলতা (যেমন বিবাহ-সম্বন্ধের ফলে 'মৌলিক' ব্রাহ্মণদের 'কুলীন' ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি) আমাদের আলোচ্য নয়।

(২) "The second type of mobility-movements were confined to the acquisition of greater respectability by individual castes without a corresponding change in the existing ceremonial mark of the castes," (P, 42) স্বশ্রেণীতে স্থিত থেকেই বৃহত্তর মান-মর্যাদার অধিকারী হবার এই সচলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নবশাখের অন্তর্গত গন্ধবণিক ও তাম্বূলবণিকদের মধ্যে। সম্ভবতঃ এই দুই জাতি ব্যবসায়ে অর্থশালী হয়ে ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ায় সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, শ্রীচৈতন্যের সংযোগেও তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল।

(৩) "The third type of mobility consisted in the formation of a dissident group and adoption by the aspiring group of a new name which is indicative of comparatively higher social position." (P, 42) মূল জাতি থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন বৃত্তি নিয়ে ধোবা, শুঁড়িরা এভাবে মধু-নাপিত, চাষা-ধোবা (পরবর্তী স্তরে সৎ চাষী), সাহা-শুঁড়িতে পরিণত

হয়। বাংলায় যে নিম্নবর্ণের নরনারী ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিল সাহা-শুঁড়িরা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) "The most important of the mobility-movements resulted in the emergence of new castes with higher ritual rank." (P. 44) গোপ এবং তেলীদের মধ্য থেকে সদ্‌গোপ এবং তিলি জাতির উদ্ভব এ-জাতীয় সমস্তর সচলতার নিদর্শন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ বৈষ্ণবগুরু-রূপে বহুমান্য হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় যত বৈষ্ণব মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং সেই মন্দিরে বৈষ্ণব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তার শতকরা ২৮ ভাগই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সদ্‌গোপ এবং তিলিরা করেছে। এর ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

নিত্যানন্দ প্রভু নবশাখ, অজলচল, মধ্যবর্তী এবং অন্ত্যজ জাতির মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পথ সুগম করেন। সপ্তগ্রামের সম্পন্ন সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য হন এবং নিত্যানন্দ শাখায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম-রূপে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। কবি কর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এঁকে বলা হয়েছে ব্রজের 'সুবাহু গোপাল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দ-শাখায় এঁর পরিচয় দিয়ে কবিরাজ-গোস্বামী লিখেছেন :

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥" (আদি ১১।)

উদ্ধারণের দৃষ্টান্তে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সমাজ (মূল 'কর্জন' সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ধনশালী) সমগ্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে এবং বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ হয়। সমস্তর সামাজিক সচলতার এই দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লিখিত আর এক প্রেমীভক্ত বিষ্ণাই হাজরা। হাজরাগণ ধোপা-জাতির সর্বনিম্ন স্তরবর্তী একটি উপজাতি। এই উপজাতির বৈষ্ণব ভক্তও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রসাদে সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন। এটিকেও সমস্তর সামাজিক সচলতার চমৎকার দৃষ্টান্ত ধরা যায়।

আমাদের আলোচনার প্রথম অংশেই বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত ও প্রেম-ভক্তি-নিষ্ণাত সামাজিক সচলতাকে এক-পুরুষ ও বহুপুরুষ-ভেদে প্রজন্মান্তর্গত (Intra-generational) এবং বহু-প্রজন্মবাহিত (Multi-generational)-এই দুভাবেও দেখা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের বহু প্রিয় পরিকর এক প্রজন্মেই

ভক্তিপথিক হয়ে বিশেষ সামাজিক গৌরবমণ্ডিত হন। শ্রীবাসাদি চার ভাই, (শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি), গদাধর দাস, খোলাবেচা শ্রীধর, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, কাশী মিশ্র, গরুড় পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, নকুল ব্রহ্মচারী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, কমলাকর পিপ্পলাই—এ রকম অজস্র ভক্তমণ্ডলীর কয়েকজন। বহু-প্রজন্মবাহিত সচলতার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায় মহাকুলীন ব্রাহ্মণ বংশীবদন চট্টো (পিতা কুলিয়া-নিবাসী ছকড়ি চট্টো বা মাধবদাস), তৎপুত্রদ্বয় চৈতন্য দাস ও নিত্যানন্দ দাস, চৈতন্য দাসের পুত্রদ্বয় রামচন্দ্র ও শচীনন্দন গোস্বামী, শচীনন্দনের তিনপুত্র, রাজবল্লভ ও কেশব গোস্বামীর নাম (শেষোক্ত দু-পুরুষ বাঘনাপাড়ার গোস্বামীবর্গ)। এই পাঁচ পুরুষের প্রথম দু-পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিবার এবং শেষ তিন-পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার। প্রত্যেকেই সাধক, পদকর্তা, বৈষ্ণবগুরু ও গ্রন্থকার-রূপে বহুমানিত। অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পরিবার। এঁরা বৈদ্যবংশীয়। সদাশিবের পিতা কংসারি সেন, পুত্র পুরুষোত্তম দাস, পৌত্র কানু ঠাকুর —চার পুরুষই গৌর-পরিকর। এঁদের থেকেই যশোহর বোধখানার এবং নদীয়া ভাজনঘাটের গোস্বামীগণের উৎপত্তি। প্রথম পরিবারের (বংশীবদনের) দৃষ্টান্তটি সমস্তর সচলতার, দ্বিতীয়টির (সদাশিব কবিরাজ) দৃষ্টান্ত স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতার।

সামাজিক সচলতার সঙ্গে সমাজে নারীর সম্মানবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্য-জননী শচীমাতা বা আই, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা দেবী, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাসের পত্নী মালিনী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রাতঃস্মরণীয়া ও বহুমান্যা। বিশেষতঃ জাহ্নবী দেবী ও হেমলতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণব-সমাজে নেতৃত্ব দান ক'রে নারীর গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেন।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের দিব্য ব্যক্তিত্বে জাতি-বর্ণভেদে বিভক্ত স্থাণু বঙ্গীয় সমাজে যে সচলতার সঞ্চার হয়েছিল তা মূলতঃ ছিল প্রেমভক্তি কেন্দ্রিক। কিন্তু এরই আশ্রয়ে সমাজের নিম্নস্তরীয় উপেক্ষিত, নির্যাতিত, অন্ত্যজ জাতিপুঞ্জ যে দৈবনির্ভর, কর্মফল বিশ্বাসী, নিরাশ্বাস, স্থবির জীবনের গ্লানিকে অনেকটাই মুছে ফেলে নবজীবনের আদর্শ, নবীন সমাজ প্রগতি, নব মর্যাদা বরণ করেছিল এবং স্ববৃত্তিতে স্থিত হয়েই হোক, বা নতুন বৃত্তি গ্রহণ ক'রেই হোক, সামাজিক সচলতাকে সম্ভাবিত ক'রে তুলেছিল এই ঐতিহাসিক সমাজসত্যকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

৪.

শ্রীচৈতন্য যে শুদ্ধা ভক্তি এবং নামপ্রেমের দিব্য আদর্শ স্থাপন করে কঠোর স্মৃতিসংহিতা-শাসিত মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষগুলির মধ্যে নবজীবন স্পন্দিত সচলতা এনেছিলেন, তার সহজসাধ্যতা পরে জটিল এবং কঠিন হয়েছিল। বৃন্দাবনের বড় গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে দিয়ে বৈষ্ণব বিধিগ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস' সংকলন করিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা লিখেছিলেন। এ গ্রন্থের বিধিব্যবস্থাদি মহাপ্রভুর সহজ সরল প্রেমধর্মকে আচার নিষ্ঠতায় বেঁধে কিছুটা আড়ষ্ট ক'রে তোলে। শ্রীচৈতন্য যে বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি মুখ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার ভার রূপ-সনাতনের উপর দিয়েছিলেন তার শুধু ধর্মীয় গুরুত্ব এবং তাৎপর্যই ছিল না। বাংলা থেকে বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রীদের গন্তব্য পথ ছিল উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্য পথের উপর। এ পথই যুক্ত করেছিল বারাণসী, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), কোয়েল (আলিগড়) প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রকে দিল্লীর সঙ্গে। বৃন্দাবনের অদূরেই আগ্রা। আগ্রার সঙ্গে যোগ ছিল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির। সুতরাং বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তীর্থযাত্রা নবশাখ ও সুবর্ণবণিক সমাজের বণিকদের বৃহত্তর ভারত ও বহির্ভারতের নতুন নতুন বাণিজ্য পণ্য ও উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে যে সাহায্য করেছিল, তার পুরোপুরি সুযোগ এঁরা নিতে পারেন নি। ফলে নিজ নিজ বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ, বৃহত্তর বণিক গোষ্ঠীতে পরিণতি এবং বৃত্তি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মাননা বৃদ্ধি যে ব্যাপকতর সামাজিক সচলতা সৃষ্টি করতে পারত, তার বিরাট সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নি। সে লক্ষ্যও ভক্তি পথিকদের ছিল না। তাই শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত সামাজিক সচলতা একটি নির্দিষ্ট বৃত্তেই আবর্তিত।

এই সচলতা প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্ম কালে প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব লাভের পর সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে বিভিন্ন মঠ মন্দিরে বৈষ্ণব মহান্তদের মধ্যে ঐশ্বর্যস্পৃহা, প্রতিপত্তি অর্জন এবং নিম্নবর্ণের জনসমাজকে অবজ্ঞা ও তাদের শোষণের প্রবণতা দেখা দেয়। কোথাও কোথাও এর রন্ধ্রপথে আসে আরো সামাজিক অনাচার। বৈষ্ণব সহজিয়াদের একাংশের বিকৃতি, 'জাত বোষ্টম' শ্রেণীর প্রতি সামাজিক অবজ্ঞা, 'গুরুপ্রসাদী' প্রথার অমানবিকতা ইত্যাদি

মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্মকে মলিন ক'রে তোলে। ফলে সামাজিক সচলতার স্রোতও স্তিমিতগতি হয়ে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যের পুণ্য আবির্ভাবের পঞ্চশত বার্ষিকীতে নামপ্রেমদ সেই মহামানবের লোককল্যাণের আদর্শকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা আজো জাতপাতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হইনি। হরিজন হত্যা এখনো ভারতের নানাপ্রান্তে অব্যাহত। আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার গরিমা আমাদের সমাজে নতুন ধরণের জাতিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই পটভূমিতে কবি গোবিন্দদাস-অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের সেই দিব্যছবিটি আমরা যেন না ভুলি :

"বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন
দান করল জগজনে ॥"

———

আধুনিক চিন্তায় ও সাহিত্যে চৈতন্য

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্য-প্রভাবে ধর্ম-শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রাণবন্যার সঞ্চার হয়। সামাজিক জীবনে প্রচলিত নানা সংস্কারের পরিবর্তন ঘটে। অথচ শতাব্দীর শেষে চৈতন্যকে দেবতার আসনে বসাবার জন্যে অহেতুক উৎসাহ পরবর্তীকালের সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে সঙ্গত কারণেই ভাল মনে হয় নি। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে চৈতন্যের মূর্তি খোদাই করা, তাঁর বাণীকে ঈশ্বরবাক্য হিসেবে প্রচার করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই মেকী আয়োজনের ফলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সামাজিক-আন্দোলনের সুযোগ ছিল তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের মানবিক আচরণ মানুষের মধ্যে সজীব ছিল বলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মানবতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল'-এ আমরা মানুষ চৈতন্যকে দেখেছি, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকেই দেববিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পরবর্তী দেড়শ'বছরের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিকে মন্থর করে দিলেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সমাজ-বাস্তবতার যে ছবি আমরা পেয়েছি তা পরবর্তীকালে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ছাড়া আর কোন মঙ্গলকবির রচনায় আমরা কেন পেলাম না তা ভাবতে বসলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং খেতুরী মহোৎসবের আয়োজক-দেরই দায়ী করতে হয়। চৈতন্যকে যদি মহাপ্রভু না বানানো হত তাহলে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন নতুন নতুন পর্যায় যুক্ত হয়েছিল সেই সৃজন-শীলতার ধারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে অব্যাহত থাকত; বৈষ্ণব পদাবলীর দৈন্যদশা আমাদের দেখতে হত না। কেবল তাই নয়, মুঘল-পদানত বাঙালী সমাজ নিজ শিরে করাঘাত না করে চৈতন্যের কাজী-দলনের অনুরূপ অত্যাচারী দলনে সমষ্টিগত ভাবে সংহত হতে পারত।

নিজ কালে চৈতন্যদেব এক অর্থে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে আধুনিক মননের জনকের ভূমিকা দেয়। এই চিন্তাধারার উদারতা তাঁকে বাংলার বাইরে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর হরিসংকীর্তনের সাহায্যে পদযাত্রা কেবল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই এমন কথা মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। সে পদযাত্রা আর্তজনের উদ্ধারে এবং অন্যায়কারীদের শাস্তিদানের ক্ষেত্রেও কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় নি। এরই পাশাপাশি চৈতন্য নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা করতেন। রামকৃষ্ণদেবের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যখন লোকশিক্ষা দেওয়া যায়, আর কোন সাহিত্য-মাধ্যমের দ্বারা তা সম্ভব না। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের রচনার পাশাপাশি রায় রামানন্দের 'নাটকগীতি'ও চৈতন্যকে আনন্দ দিত—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ দামোদর সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুন পরমানন্দ ॥

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনীকে নিয়ে রচিত যাত্রায় মহাপ্রভু স্বয়ং অভিনয় করতেন, এ তথ্য 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আছে।—

তবে আচার্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা ॥

সংস্কৃত ভাষায় রচিত রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটগীত চৈতন্যকে বেশী আকৃষ্ট করার কারণ সে নাটকে শেষ অঙ্কে রাধা কৃষ্ণের সম্ভোগের আভাসমাত্র দিয়ে ক্ল্যাসিকাল নাট্যকলার সংযম মানা হয়েছিল। এর অর্থ নাটকের মধ্য দিয়ে যাতে জনরুচি বিকৃত হওয়ার সুযোগ না পায় সে দিকে চৈতন্যদেবের লক্ষ্য ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। হিন্দুধর্মের জল-অচল সংস্কার তাঁর কাছে। ঘৃণার বিষয় ছিল। হরিদাস যবন পুরী প্রবেশের অধিকার তার ছিল না। পথে বসেই তিনি নামগান করছিলেন। কাশী মিশ্রের অনুমতি নিয়ে চৈতন্যদেব হরিদাসের জন্য স্বগৃহের কাছে ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। সেকালে এসব বিষয় নিয়ে যাত্রা লেখা হয়নি, হলে চৈতন্যদেব অবশ্যই তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উনিশ শতকের শেষে বাংলা নাটকে যে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা মাঝেমধ্যে বলা হয়েছে তাতে চারশ বছর আগে

চৈতন্যের জীবনাচরণ অনুসৃত হতে দেখি। তিনি দাক্ষিণাত্যে কেবলমাত্র রায় রামানন্দের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন নি, অন্যান্য দক্ষিণী ভক্ত সম্প্রদায়ের—শৈব, বৈষ্ণব, রামায়তদের সঙ্গেও মিলিত হয়ে তাদের পুরুষার্থ, লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আধুনিক যুগের আগে ধর্মবিষয়ে এমন উদার দৃষ্টি অকল্পনীয় ছিল।

অথচ আশ্চর্য উনিশ শতকে সেকসপীয়র চর্চা, কালিদাস-চর্চা জমে উঠলেও নতুন চিন্তা চেতনার নিরিখে চৈতন্য চর্চা হল হল না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে মানুষ-এর আলোয় প্রতিসরিত করলেন 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে, কিন্তু চৈতন্যের ভূমিকা আলোচনায় তিনি একটিমাত্র বাক্য ব্যবহার করেই থেমে গেলেন।

অন্যদিকে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান-এর ক্ষেত্রে চৈতন্যকে কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

গোঁড়া ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন চৈতন্যের পথানুসরণে যে নগরসংকীর্তনের প্রবর্তন করেন তাতে মূল গানটি ছিল—'যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।' 'ভক্তি'ই কেশবচন্দ্রের জীবনের সার সাধন।—যুক্তি নয়। উনিশ শতকে বহু প্রচারিত Utilitarianism (হিতবাদ) এবং Positivism (প্রত্যক্ষবাদের) বিরোধিতা তিনি সে কারণেই করেছিলেন। 'চৈতন্য সমাগম' সম্পর্কে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল পিতামহ রামকমল সেনের চৈতন্য-অনুরাগ। কিন্তু সে যাই হোক, এর ফলে চৈতন্যদেবও সে যুক্তিবিরোধী বলে চিহ্নিত হলেন তা কি যথাযথ হল? বরং শিশিরকুমার ঘোষ-এর 'অমিয়নিমাইচরিত'-এ সে অপবাদ খণ্ডিত হয়েছিল। এভাবেই নবীনচন্দ্র সেন চৈতন্য-কে—উদার দৃষ্টিতে বিচার করে গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'খ্রীষ্ট' গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে তিনি বলেছেন—'ভারতীয় আর্যধর্মাবলম্বীরা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্মমত অনুসরণ করে না। অতএব তাঁহাদের ধর্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত নাম মানবধর্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী।... কৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলই আর্য ধর্মাবলম্বীদের কায়ছ অবতার স্বরূপ পূজনীয়।' শেষ বাক্যটিতে আপত্তির কারণটি এই প্রবন্ধের শুরুতেই বিশ্লেষণ করেছি। তবে নবীনচন্দ্র Hindu Revival—এর ঘনিষ্ঠ পূজারী হলেও ব্রাহ্মণ্যমত বিরোধী ছিলেন। তাই চৈতন্য প্রমুখের মানবিক দিকটি তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি।

নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক, মতের দিক থেকেও অনেকটা ঘনিষ্ঠ। বঙ্কিম-এর কাছে বৈষ্ণব ধর্মের অতিরিক্ত ভাবাবেগ বিরক্তির কারণ হয়েছিল। তাঁর মনে

হয়েছিল এজন্য চৈতন্যও কিছুঅংশে দায়ী। মন্দির দ্বারে বারংবার তাঁর মূর্চ্ছা, অদ্বৈতাদি কর্তৃক নানা উপাচারে চৈতন্যকে অর্চনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। 'নবজীবন' পত্রিকায় 'ধর্ম জিজ্ঞাসা'য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—"অন্যের কথা দূরে থাকুক, শাক্য সিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য—তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।' আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অনেকটা একমত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কি হিন্দুধর্মের ভাবাবেগে অনেক সময়ই একদেশদর্শী হয়ে পড়েন নি? অন্ততঃ আনন্দমঠ-সীতারাম-রাজসিংহ-উপন্যাসের পাঠকরা এ প্রশ্ন তুলতেই পারেন। মনে রাখতে হবে, চৈতন্যদেব ছিলেন ধর্মপ্রচারক, আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' ঔপন্যাসিক।

তার চেয়ে চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা নাটকের দিকে আমরা চোখ ফেরাই। উনিশ শতকের বাংলায় খ্রীষ্টান-হিন্দু-ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে যেমন রেষারেষি প্রবল ছিল তেমনি একই ধর্মের মানুষদের মধ্যেও বিভেদ কম ছিল না। হিন্দুধর্মে প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পন্থীদের আমরা ভালভাবেই চিনেছি, ব্রাহ্ম ধর্ম ত ত্রিধা বিভক্ত হয়েছিল। সারা বাংলায় ধর্ম নিয়ে যখন এই হানাহানি চলছিল তখনই এক গ্রাম্য যুবকের দেখা মিলল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। হিন্দুধর্মের বিস্মৃত-গৌরব পুনরায় ফিরে এল—শুরু হল পুরাণ ও গীতার নবঅনুশীলন। উনিশ শতকের যুক্তিবাদী সমাজ চিন্তার সঙ্গে পুরাণের এই নব ব্যাখ্যার সমন্বয় এক অভিনব ঘটনা সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা নাটকে চৈতন্যের উপস্থিতি চোখে পড়ে না, এমনকি বাংলার প্রবন্ধকারগণও তাঁকে উপেক্ষা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্মাবলীদের একত্র করবার জন্য চৈতন্যদেবের চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী থেকে।

'আন্তরিক হইলে সর্বধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খ্রীষ্টান এঁরাও পাবে। কেউ কেউ ঝাগড়া করে বসে।...এসব বুদ্ধির নাম মতুয়া বুদ্ধি। অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ ধরে পৌছান যায়। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।' সকলেই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে পাবার জন্য জনসেবাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দও লোকসেবাকে জীবনের উদ্দেশ্য করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে যে চৈতন্যদেবকে এনেছিলেন তিনি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হলেও হঠযোগে বিশ্বাসীছিলেন না। সেজন্যই তাঁর রচিত

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় সুদূর পল্লীগ্রামেও প্রভাব সঞ্চার করেছিল। কর্ণেল অলকট এই নাট্যাভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রবণতা লক্ষ্য করেই দুটি নাটক লেখেন 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস'।

তবু বলতেই হয় 'চৈতন্যলীলা' উচ্চশ্রেণীর নাট্যকর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম থেকে চৈতন্য চরিত্রে অবতারত্ব প্রয়োগই এর অন্যতম ত্রুটি। অথচ বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' মধ্যখণ্ড পর্যন্ত চৈতন্যচরিত্র যে ভাবে আঁকা আছে তা থেকে নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ সম্ভব ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দ নন, তাঁর সেই সীমাবদ্ধতা 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকেও দেখি। চৈতন্য জীবনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে নীলাচল গমন পর্যন্ত অনেক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে 'নিমাই-সন্ন্যাস'-এ। পূর্বের নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার কর্ণধার শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে 'নিমাই সন্ন্যাস' লেখা হয়। নাট্যকাহিনীর আদর্শ বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য জীবনী। চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যৌথ প্রকাশ কৃষ্ণদাসের কাব্য থেকে এবং নিমাই-এর গৃহত্যাগের রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গসজ্জার বিষয় লোচনদাসের কাব্য থেকে নেওয়া। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত এক্ষেত্রেও নাট্য পরিণতি মিলনান্তক করার জন্য শেষ অংশে নাট্যকার নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে 'ভাবসম্মিলন' ঘটিয়েছেন।

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে অত্যধিক গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রাধান্য ঘটায় থিয়েটারে নাটকটি বেশিদিন চলেনি। 'চৈতন্যলীলা' অপেক্ষা 'নিমাই সন্ন্যাসের' সংলাপ যে 'বড় বড় তত্ত্বকথার দ্বারা পূর্ণ' একথা স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য কোন কোন জায়গায় সুন্দর ভাষাপ্রয়োগে এই ত্রুটি কিছুটা দূর হয়েছে।—

নিমাই।

হবে এ জীবন ফুল্ল নিধুবন
হৃদি ফুল্ল কনক-আসন,
ওহে বাঁকা হয়ে মুরলী বদন,
রাধা অঙ্গে অঙ্গ মিলাইছে,
চোখে চোখ চেয়ে,
করিবে রে প্রেম বিনিময়,...(৪/১)

অথবা—

বিষ্ণুপ্রিয়া।....
দেখ দেখ বিনায়েছি বেণী
ফুলসাজে সেজেছি সজনি,
পরেছি লো যা লো সখি!
'আন তুলে ফুল, মালতী বকুল
গাঁথিব চিকণ মালা,
বলে গেছে
আসিবে আসিবে প্রাণনাথ। (৪/৭)

নিমাই সন্ন্যাসের কাহিনী যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অগোছাল। এর ফলে নাট্যরস গাঢ় হতে পারেনি। অবশ্য কোন কোন সংলাপে রোমান্টিকতায় ভরপুর মানব চৈতন্যের পরিচয় মেলে। বিপরীতে 'রূপ-সনাতন' নাটকের বৈরাগ্যের আবহাওয়া চৈতন্য-সত্তাকে পুরাণসর্বস্ব করে তুলেছে। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের চৈতন্য-চর্চার সীমা এখানেই। নিমাই-এর জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকা একেবারে উপেক্ষনীয় ছিল না। বাঙালী ঘরের গার্হস্থ্য সুখ অভিলষিনী এই নারীকে নিমাই বুঝেছিলেন, বাঙালী নাট্যকাররা বোঝেন নি? গিরিশচন্দ্রের বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। এই নাটক লেখার ৪৬ বছর পর ১৯৩১-এ নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নামে একটি নাটক লেখেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, সামাজিক রাজনৈতিক নাটকের বহুল প্রচার হচ্ছে, হিজলী জেলে বন্দীদের উপর গুলিচালনার ঘটনাও ঘটেছে। এমনই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসে উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অবলম্বন করে যে নাটক লেখা হবে তাতে অলৌকিকতা থাকতে পারে কিন্তু মানবরস অনুপস্থিত থাকবে কেন? যোগেশ চৌধুরী কিন্তু সে পথে হাঁটলেন না। অবশ্য তিনি যদি সাম্প্রতিককালে এ নাটকটি লিখতেন তাহলে জনরুচির তাগিদে নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে লৌকিক প্রেমের সঞ্চার ঘটাতে বাধ্য হতেন। একালে লেখা 'মারীচ সংবাদ', 'রামযাত্রা', 'লেহার ভীম', 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ইত্যাদি যাত্রা ও নাটকের কথা স্মরণে রেখেই এই মন্তব্য করছি।

ঐ ১৯৩১ সালেই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটক স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে বাসুদেবের গলিতকুষ্ঠ থেকে উদ্ধারলাভ, বারোজী উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনাযুক্ত করে চৈতন্যের জনসেবক রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া গিরিশচন্দ্র যোগেশচন্দ্র থেকে কিছুটা আলাদা

হয়ে মানুষী রূপে পরিগ্রহ করছিল, কিন্তু তিনিও শেষরক্ষা করতে পারেননি। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক. চৈতন্যজীবনীর অত্যধিক প্রভাব; দুই. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত জীবনী নাটকের উপর অলৌকিকতার প্রভাব। সেসব যাই হোক না কেন অত্যধিক পুরাণ প্রভাব চৈতন্যাশ্রয়ী নাটককে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করায় একজন সমাজসংগঠকও দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, সেটাই বেদনার কথা।

চৈতন্যের জন্মের পাঁচশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নতুন ভাবে তাঁর উপর আলোচনা চলছে। আজ থেকে কিঞ্চিদধিক চারশ' বছর আগে খেতুরী মহোৎসবেও বৈষ্ণব অনুরক্তরা সে কাজটি করেছিলেন। সেদিন কাজের কাজ কিছুই হয়নি, বৈষ্ণব সহজিয়াদের তাঁরা আটকাতে পারেননি। বৈষ্ণব পদসাহিত্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ায় বৈষ্ণব পদসংকলন বার করে চৈতন্য-অনুরক্তরা খুশী ছিলেন। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর এই মুখর আধুনিকতার যুগে চৈতন্য-বিশ্লেষণ মাত্র হতে পারে, চৈতন্য-অনুসরণের কোন সুযোগ নেই। তবে শ্রীচৈতন্যের মানবিক আচরণ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনকল্যাণমূলক কার্যধারার আলোচনা অবাঞ্ছিত নয়। একথা ও অস্বীকার করে লাভ নেই যে চৈতন্যদেবের কর্মপদ্ধতিতে অচল-অনড় ভারতবর্ষের মাটিতে মানবিকতার হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। অসামাজিক জগাই-মাধাই সুস্থ সমাজ-মানুষ-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। সেটাই বা কম কি?

———